অনুসরণ

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়

Papia Ghoshal

অনুসরণ

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়

Papia Ghoshal

অনুসরণ

অনিরুদ্ধ বসু

অনুবাদঃ পার্থ মুখোপাধ্যায়



স্মৃতি পাবলিশার্স

ANUSARAN
A Bengali Novel by ANIRUDDHA BOSE
Published by SMRITI PUBLISHERS
Website : www.smritipublishers.com

প্রথম প্রকাশঃ মে ২০২১
প্রথম ই-বুক প্রকাশঃ মে ২০২১

প্রচ্ছদপটঃ পাপিয়া ঘোষাল
অলংকরণঃ অনিরুদ্ধ বসু

প্রকাশকঃ
স্মৃতি পাবলিশার্স
"ওয়েসিস" সি এফ - ৪১
সেক্টার ১
সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০০৬৪

ISBN : 978-81-949636-2-2

উৎসর্গ

অজয়দা

মাননীয়েষু

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই, বিশেষ করে গত দু-তিন দশকে আমাদের জীবনযাত্রার ধরন যেমন বদলেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে চেহারা বদলেছে পৃথিবীর অন্ধকার জগতেরও। সেই নিরিখে স্বভাবতই পিছিয়ে নেই আমাদের দেশও। চলতি থ্রিলার উপন্যাসে এই অন্ধকার জগতকে তুলে ধরা যে অসম্ভব, মোটামুটি বিশ শতকের শেষ পর্ব ঘনিয়ে আসার কালপর্ব থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। স্বভাবতই ধরন বদলাচ্ছিল এরকম লেখালেখিরও। কিন্তু তখনো আমাদের দেশে এ রকম লেখাপত্রের দেখা প্রায় মিলত না। বদলে, দেখা যেত প্রাইভেট ডিটেকটিভদেরই রমরমা, যা এখনও বাংলা রহস্য সাহিত্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এ ধরনের উপন্যাস-গল্পে অপরাধের চেহারা প্রধানত ঘোরাফেরা করত মধ্যবিত্ত ঘেরাটোপে দেশের মধ্যেই। গত এক-দেড় দশকে যদিও সেই চেহারাটা খানিকটা বদলাচ্ছে, কিন্তু সমাজের ওপরতলায় অপরাধের চেহারা যতটা বদলেছে তার সঙ্গে বাংলা সাহিত্য সমানভাবে তাল রাখতে পারেনি। তাই এধরনের উপন্যাস-গল্পে কপোল কল্পনার ছাপ প্রকট। কখনো কখনো গল্পের গরুকে গাছে তোলার চেষ্টায় লেখার মান যে হানি হয়নি, তা-ও নয়।

অনিরুদ্ধ বসুর লেখালেখি ও ভাবনাচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য এই বদলে যাওয়া সময়েরই ভেতরের চেহারাটা। তিনি কলম ধরেন তাঁর পেশার মতো, সময়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কাটাছেঁড়া করাতে। এই বদলে যাওয়া সময়ের ভেতরের টালমাটাল চেহারাটা পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। সাহিত্য তাঁর কাছে নিছক অবসর বিনোদন নয়। বদলে যাওয়া একবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা ও প্রকাশে পাঠককে বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড় করাতে, আধুনিক ভাষাশৈলী, চিন্তাধারার ভাণ্ডার নিয়ে।

অন্যান্য লেখাপত্রের পাশাপাশি থ্রিলারধর্মী লেখাতেও পাঠককে স্রেফ রোমাঞ্চ উপহার দিয়েই কর্তব্য সমাধান মনে করেন না। বরং চান বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে আজকের রূঢ় বাস্তবকে তুলে ধরতে। তাই তার প্রথম উপন্যাস 'চক্র' তে কল্পনার ডিটেকটিভকে পেছনে ফেলে একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার কথা মাথায় রেখে, প্রচলিত দেশি ও বিদেশি প্রথার বেড়া ভেঙেছেন। চিরাচরিত কল্পনার ডিটেকটিভকে বাদ দিয়ে এ যুগের বাস্তবধর্মী নতুন চিন্তাধারার বিন্যাস। পাঠক খুনির সঙ্গে ডিটেকটিভকেও খুঁজছে। এই বিকল্প চিন্তাধার প্রকাশ 'কনড্রাম' 'প্রহেলিকা' 'ইটারন্যাল মেহেম' 'ইফ…', মার্ডার@করোনা.টাইম' প্রভৃতি উপন্যাসে।

অনুসরণ লেখার পটভূমি আজকের ভারত শুধু নয়, গোটা বিশ্ব। এ-লেখায় এক... দুই...তিন... চার... করে একের পর খুন। শুধু ভারতে নয়, তার গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। আপাত কারণহীন খুনেগুলোর জট খুলতে কেবল পুলিসই নয়, র সহ বিভিন্ন দেশের সরকারি অনুসন্ধানী সংস্থা জড়িয়ে পড়েছে উপন্যাসের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে। সঙ্গে মানুষের সীমাহীন লোভ। সেই লোভের জালে জড়িয়ে পাক খেয়েছে বিভিন্ন দেশের মানুষ। শেষে সমস্ত সুতোর জটই যে খুলেছে তাই নয়, উন্মোচিত হয়েছে কাল নির্বিশেষে মানবিক অনুসন্ধানের পরিপ্রেক্ষিতও।

পাঠকের জন্যে লেখক থ্রিলারের আবহে তুলে এনেছেন মানব জীবনের চিরায়ত প্রশ্ন, যার উত্তরে নিহিত মনুষ্যজীবনের অনুসন্ধানের ইতিবৃত্ত। যে সত্য পার্থিব হিসেবের বাইরে।

আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ধীরে ধীরে জমে ওঠা এই থ্রিলারের বঙ্গানুবাদ একুশ শতকের বাংলা রোমাঞ্চ সাহিত্যে অন্য মাত্রা যোগ করবে। এ লেখার বিন্যাসে সেই আবহমানতার ইঙ্গিত যা ব্যতীত সাহিত্যকীর্তির সাময়িকতার সীমানা পেরোনো অসম্ভব।

পার্থ মুখোপাধ্যায়

ফেব্রুয়ারি ২০২১

অনিরুদ্ধ বসু সম্বন্ধে কিছু কথা...



পেশায় প্লাস্টিক সার্জেন, নেশায় লেখক অনিরুদ্ধ বসুর জন্ম ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ কলকাতায়। বি ই কলেজের স্নাতক ইঞ্জিনিয়ার বাবা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্র মোহন বসু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রৌপ্য পদক প্রাপ্ত বাংলার স্নাতকোত্তর মা স্বর্গীয় ইলা বসু-র উৎসাহে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ। পরে ইউনাইটেড কিংডমের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেনস থেকে এফ আর সি এস। ইংল্যান্ডে বহু বছর কাটিয়েছেন। দু-বছর মধ্য প্রাচ্যেও। এখন কলকাতার প্রখ্যাত প্লাস্টিক সার্জেন। দেশে ও বিদেশে অন্যতমদের মধ্যে একজন।

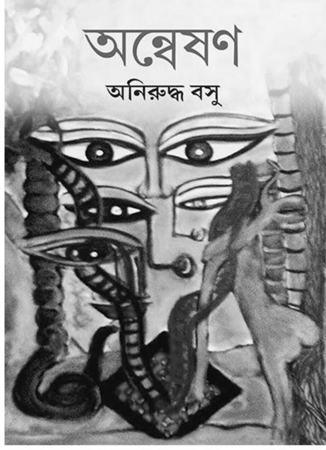
ছোটবেলা থেকেই লেখায় আসক্তি। স্কুল পত্রিকা 'নিহিল উল্ট্রার' সম্পাদক পদের দায়িত্বে থাকাকালীন নিয়মিত সাহিত্যচর্চা। বহু পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি। পরে ইংল্যান্ড ও কুয়েতে সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

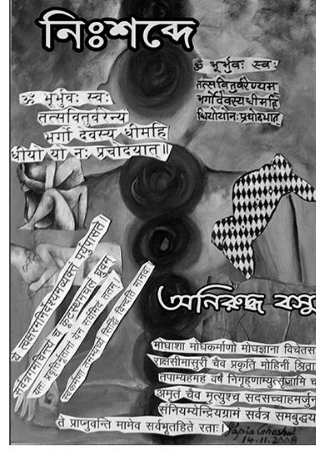
নিয়তি কেন বাধ্যতে। অনেক সময় নিয়তি বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ব্যস্ততার মধ্যে ২০০৬ শালে পায়ের হাড় ভেঙে ছ'মাস হুইলচেয়ারে থাকাকালীন সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় পুনরায় লেখালেখি শুরু। সেই সময় 'অন্বেষণ' উপন্যাস রচনা। যা প্রকাশিত হয় ২৫ আগস্ট ২০০৭-এ। নতুন আঙ্গিকের এই উপন্যাস সাড়া ফেলে দেয় সংস্কৃতি মহলে। বেস্টসেলার শুধুই হয়নি, ব্যস্ত প্র্যাকটিসের মধ্যেও লেখায় অনুপ্রেরণা জোগায়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'নিঃশব্দেও বেস্টসেলারের খাতায় নাম লেখায়। শুধু তাই নয়, লন্ডন বুক ফেয়ার ও জাতীয় মাধ্যমে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। ভবিতব্য নতুন সৃষ্টির দিক খুলে দিগন্তে নতুন দিশার আলো দেখায়। বহু দেশ থেকে সংগৃহীত মানুষ, সমাজ, উপলব্ধি বন্দি হয় তার লেখনীর বিভিন্ন আঙ্গিকে। ব্যস্ততার মধ্যেও সময় খুঁজে নেয় নতুন চেতনার রচনাশৈলীতে। খুনের গল্পের বিবর্তন থেকে বৈজ্ঞানিক দর্শন তার লেখাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

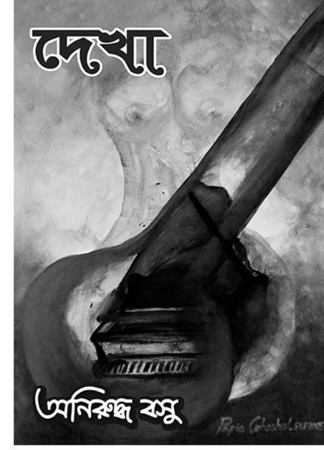
এই উপন্যাসটি 'অনুসরণ' ভিন্ন স্বাদের। বারবার নিজেকে ভাঙার মধ্যেই তার নতুনত্বের প্রকাশ। প্র্যাকটিসের বাইরে সেখানেই তার শান্তি। তার প্রতিটা উপন্যাস মৌলিক চিন্তাধারার ফসল। অনেক ক্ষেত্রে সাবেকিয়ানা ভেঙে বেরবার প্রয়াস। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সত্যকে নতুন করে খুঁজে চিনতে। তাকে লেখনীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে।

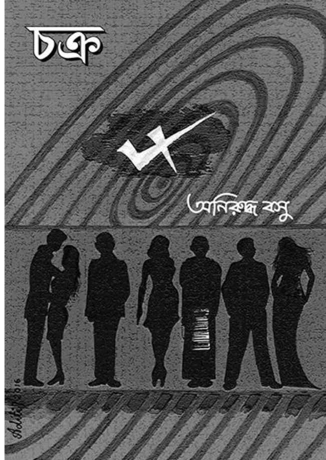
রবীন্দ্রসংগীত, ক্লাসিক্যাল সংগীতের অনুরাগী অনিরুদ্ধ বসুর শান্তির নীড় স্ত্রী স্মৃতি বসু।

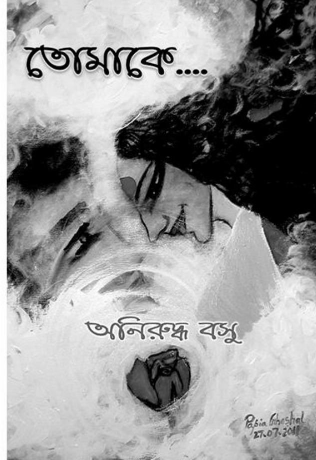
লেখকের অন্যান্য বাংলা উপন্যাস



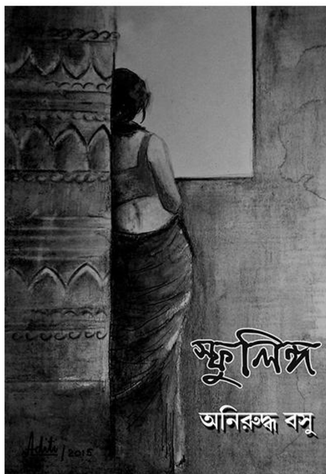








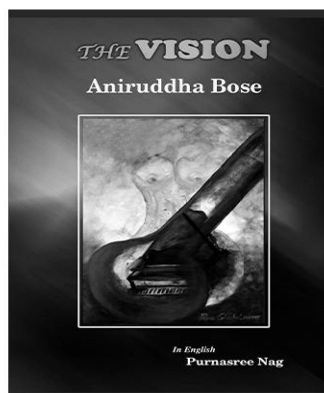


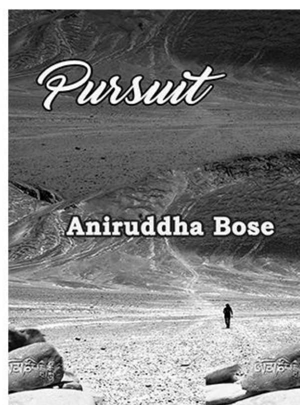


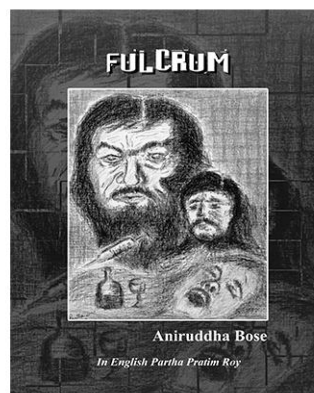


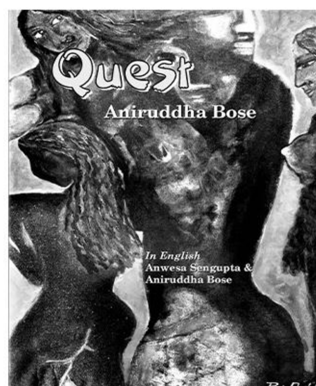


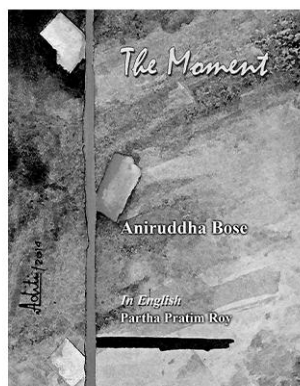
লেখকের অন্যান্য ইংরেজি উপন্যাস

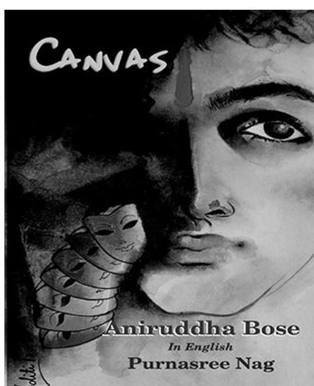

THE VISION
Aniruddha Bose
In English
Purnasree Nag

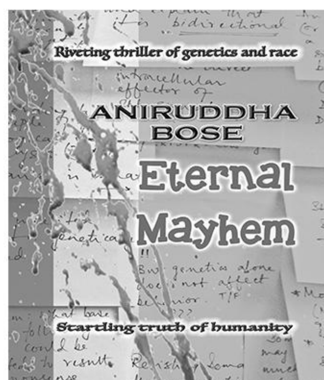

Pursuit
Aniruddha Bose


FULCRUM
Aniruddha Bose
In English Partha Pratim Roy

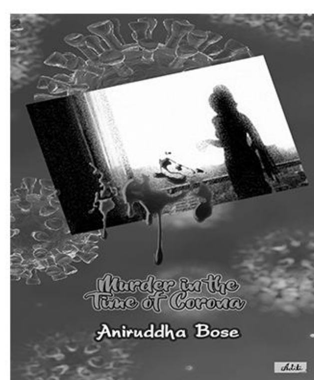

Quest
Aniruddha Bose
In English
Anwesa Sengupta &
Aniruddha Bose

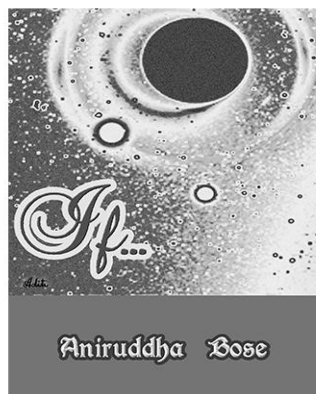

The Moment
Aniruddha Bose
In English
Partha Pratim Roy

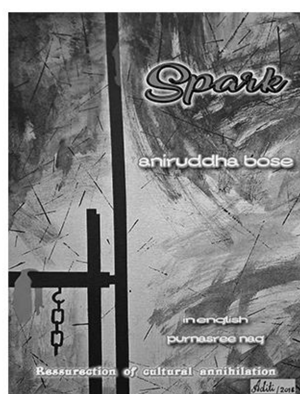

CANVAS
Aniruddha Bose
In English
Purnasree Nag

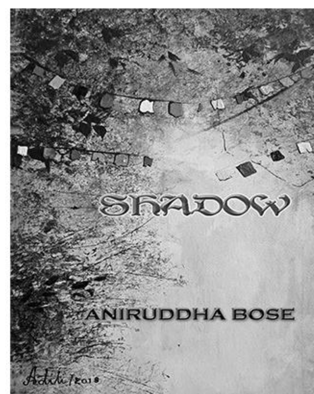

Riveting thriller of genetics and race
ANIRUDDHA
BOSE
Eternal
Mayhem
Startling truth of humanity


Aniruddha Bose
Conundrum
Spine-chilling brain-teaser


Murder in the
Time of Corona
Aniruddha Bose


If...
Aniruddha Bose


Spark
aniruddha bose
in english
purnasree nag
Ressurection of cultural annihilation


SHADOW
ANIRUDDHA BOSE

এয়ারপোর্টের টার্মিনাস থেকে ট্রলি ঠেলে বেরোবার সময় এলেনা লক্ষ করল আত্রেয়ী আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। কিছু বোঝবার আগেই দেখল ওর সুন্দর ট্রিম করা চুলের মধ্যে থেকে রক্তের ধারা টার্মিনাসের মেঝেয়। যদিও কোনও আওয়াজ হয়নি, বুঝতে অসুবিধে হল না কেউ ওর মাথায় গুলি করেছে। গুলির কোনও শব্দ নেই। সম্ভবত তার বন্দুকে সাইলেন্সার লাগানো। এলেনা নিচু হয়ে আত্রেয়ীর পালস দেখল। নেই। টার্মিনাসে অসহায় এলেনা দাঁড়িয়ে। জনবহুল এয়ারপোর্ট চত্বরে পাশে কেউ নেই। অনেকটা জ্বলন্ত জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাসাব্লাঙ্কার মতো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঘিরে ভিড় জমে গেছে। আশেপাশে সন্দেহজনক কাউকে খুঁজছে। দেখতে পেল না। সবই স্বাভাবিক। প্রফেশ্যনাল কিলাররা যে চোখের পলকে অবস্থার সঙ্গে নিজেদের হাবভাব বদলে নেয়, এটা জানা। অনেকেই আন্দাজ করেছে আত্রেয়ীকে গুলি করা হয়েছে। মাথায় আসছে না আচমকা এরকম জনবহুল জায়গায় ঘটনাটা ঘটল কীভাবে। কেনই বা?

রাজনৈতিক খুনখারাপি বা অন্ধকার জগতের মারামারি আর সব দেশের মতো বাংলাতেও আজকাল আকচার। সামান্য কারণে এরকম শ্যুট অ্যান্ড কিলের ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু এরকম নিঃশব্দ খুনের সঙ্গে কারও পরিচয় নেই। এখানে সম্পূর্ণ নতুন। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও চেনা খুনি। কিন্তু কেন? তাও আবার জিনস-টপ পরা সুন্দরী ফর্সা বছর বাইশ-পঁচিশের মেয়েকে। ও তো তেমন কোনও বিউটি কুইনের দৌড়ের সুন্দরী নয় যে পলকে ভিড়ের মধ্যে থেকে আলাদা করে নেওয়া যায়।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠিক কী করবে এলেনা ভেবে পেল না। ঘটনার খবরে ততক্ষণে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটির লোক হাজির।

‘এয়ারপোর্ট সারভেইল্যান্সের হেড। কীভাবে সাহায্য করতে পারি?’

‘অ্যাম্বুলেন্স চাই। এক্ষুনি।’

ভিড়ের মধ্যে থেকে মধ্যবয়স্ক একজন এগিয়ে এল, ‘অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা করার দরকার নেই। এখুনি কাছাকাছি কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমার গাড়িতে আসুন।’ এয়ারপোর্টের সারভেইল্যান্স হেড আর এলেনাকে ডাকল, ‘আসুন। কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যাক।’ আপত্তি করার কোনও কারণ নেই।

তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হল নেতাজি সুভাষ ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্টের কাছেই চার্নক হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে। ইমারজেন্সি মেডিক্যাল অফিসার দেখেই নিচু শান্ত গলায় সত্যিটা জানিয়ে দিতে সময় নিল না, ‘দুঃখিত। বেঁচে নেই। আসার আগেই মৃত্যু হয়েছে। ইনি কে? বডি পোস্ট মর্টেমে পাঠাতে হবে।’

এলেনার দিকে সবার চোখ। মহিলার সঙ্গে তো একা সে-ই। এলেনা চুপ করে বসে। আর সকলের মতো সেও যথেষ্ট অন্ধকারে। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আস্তে বলল, ‘আমিও ঠিক চিনি না। দিল্লি থেকে প্লেনে আমার সঙ্গেই এসেছে। পাশের সিটেই বসেছিল। জিগ্যেস করায় নাম বলেছিল আত্রেয়ী। ফ্লাইটে কিছু কথা হয়েছে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড জানা নেই। আগে দেখিইনি।’

হাসপাতালের স্টাফরা পুলিসের সামনেই আত্রেয়ীর হ্যান্ডব্যাগে পরিচয়পত্র খুঁজল। নাঃ, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, এমনকী ভোটার আইডি কার্ডও নেই। শুধু লিপস্টিক, কনডোম আর একটা স্ট্রিপ, বোধহয় ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল। এসব থেকে ওর পরিচয় পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

‘আনআইডেন্টিফায়েড বডি। পুলিস তাহলে এবার তাদের প্রোটোকল মেন্টেন করুক।’ এমারজেন্সি মেডিক্যাল অফিসার বলল।

ইনভেস্টিগেটিং অফিসার মানতে পারছে না, ‘কোনও আইডেন্টিটি না থাকলে প্লেনে উঠল কী করে?’

রহস্যের কোনও আপাত সদুত্তর নেই। এলেনা আর জড়াতে চায় না। ক্লান্ত, বিরক্তও। কোথায় প্লেনে কে তার পাশে বসেছিল বলে সে আর কী-ই বা করতে পারে? ফালতু টানাটানির মধ্যে জড়াতে চায় না। এখন হোটেলে যেতে পারলে বেঁচে যায়। মালপত্র তুলে বলল, ‘একটা ক্যাব ডেকে দিলে ভালো হয়।’

ততক্ষণে লোকাল পুলিসও হাজির। অফিসার বলল, 'যাওয়ার আগে ম্যা'ম আপনার ডিটেলস যদি একটু দিয়ে যেতেন... যদি দরকার হয়। জাস্ট নিয়ম রক্ষা।'

এলেনা আইডেন্টিটি প্রুফগুলো এগিয়ে দিল, 'যেটার দরকার জেরক্স কপি করে নিন। দয়া করে আর আটকাবেন না।'

'উঠছেন কোথায়?'

'ক্যামাক স্ট্রিটের হোটেল হ্যামিলটনে।'

'থ্যাঙ্কস ম্যা'ম...'

কাগজগুলো জেরক্স করার পর অফিসারই মোবাইলে একটা উবের ডাকাল।

***

জিয়া প্যান্টিটা নামিয়ে দীপাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, 'জামা-কাপড় পরেই কী করবে নাকি?'

নির্বিকার আমন্ত্রণে হকচকিয়ে গেল দীপাঞ্জন। যতই উত্তেজিত হোক না কেন এরকম খোলাখুলি আহ্বান আজ অবধি পায়নি। গ্লোব সিনেমার পাশে নিউ লিন্ডসে হোটেলের এই ঘরটা যথেষ্ট সাজানো। আগেই বুক করে রেখেছিল। জিয়ার সঙ্গে সম্ভোগের অপেক্ষায়। ওকে দেখেই উত্তেজিত। মোবাইলে কথা বলার সময়েই জিয়া বুঝিয়ে দিয়েছিল সে অন্যরকম। কোনও স্টার হোটেল পছন্দ নয়। আবার হেজিপেঁজি ঠেকও না-পসন্দ। ব্যস্ত শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত দুটোর মাঝামাঝি নিউ মার্কেটের উলটো দিকে এই নিউ লিন্ডসে। নিচে রাস্তার দিকে তাকালেই চোখে পড়ে কালো কালো মানুষের মাথার সারি আর ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দিকে বয়ে যাওয়া গাড়ির মিছিল।

এই গোপন অভিসার দীপাঞ্জনের কাছে একটু অস্বস্তিরই। এমন নয় জিয়াকে অনেক দিন ধরে চেনে। কিছুদিন আগে সাইবার চ্যাটে আলাপ। পরে অবশ্য স্কাইপে ছবি দেওয়া নেওয়া। প্রথম ওর ছবি দেখে টাইট জিনস, সাদা টপে। সাদা টপের আড়ালে ওর আঁটসাঁট দেহটা উত্তেজনা ছড়িয়েছিল পৌরুষে। ওর শরীরের গভীর অরণ্যে ডুবে যাওয়ার লিপ্সায় কামনায় ভরপুর। ছবি দেখেই অবস্থা খারাপ। দেহ চাইছে ওর দেহে মিশে যেতে।

ভিডিও চ্যাটে দীপাঞ্জনের উত্তেজনা খেয়াল করেই আকর্ষণীয় ঠোঁটে মুচকি হেসে জিয়া বলেছিল, 'শুতে চাও আমার সঙ্গে?'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দীপাঞ্জন সম্মতি জানাতেই, সে বলে 'বেশ তো, একটা হোটেলের ব্যবস্থা করে জানিও'

ট্রাউজারের জিপার খুলতে খুলতে এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না তার দিবারাত্রির স্বপ্ন অবশেষে সফল হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই বিবস্ত্র জিয়া বিছানায়। পা দুটো ফাঁক করতেই ওর উন্মুক্ত যোনির দিকে তাকিয়ে দীপাঞ্জনের দম বন্ধ হয়ে এল। চটপট জামা প্যান্ট খুলে পাশে।

'তাড়াতাড়ি করো। কতক্ষণ পা-ফা ফাঁক করে থাকব?' জিয়া হাত দিয়ে যোনি আড়াল করল। যত নগ্ন শরীরটা মেলে থাকবে ততই দীপাঞ্জনের দ্বিধা কাটাতে সময় লাগবে। ওর কাজ আছে। দীপাঞ্জনের পুরুষাঙ্গের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকার অত সময় নেই।

অরগ্যাজমে পৌঁছতে পোঁছতেই মোবাইল বেজে উঠল 'আসছি। প্রায় হয়ে গেছে।'

ফোন কেটে দিল। জিয়া যখন জামাকাপড় পরে, চুল ঠিক করে লিপস্টিক লাগাচ্ছে, তখনও দীপাঞ্জন আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সময় নিয়েই লিপস্টিক বোলাল। হোটেলের রুমে যখন ঢুকছিল ঠিক তখনকার মতোই। নগ্ন শোয়া দীপাঞ্জনকে দেখে বলল, 'যেতে হচ্ছে। বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট। দেরি হয়ে গেছে। সময় নেই। আশা করি ভালোই লেগেছে।'

দরজা খুলে বেরোতে গিয়েও জিয়া পিছিয়ে এল। খানিকটা খুলে এমনভাবে বন্ধ করল যেন কিছু ভুলে গেছে। ঘুরে ব্যাগ থেকে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বার করে দীপাঞ্জনের কপালে সোজা গুলি।

পিস্তলটা ফের ব্যাগে ঢুকিয়ে ওর কাছে। চোখের পাতা খুলে মণি দেখে নিশ্চিত হল কাজটা হয়ে গেছে। মৃত্যুটা নিশ্চিত করে চটপট দীপাঞ্জনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওর পার্সটা হাতড়ে বার করল।

হ্যাঁ, যা খুঁজছিল সেটা আছে।

পার্সটা হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'ঈশ্বর তোমার আত্মার শান্তি দিক।'

দরজাটা পেছনে টেনে লক করে অলক্ষিত জিয়া জনসমুদ্রে মিশে গেল।

***

রাত এগারোটা।

রিয়া শেষ ড্রিঙ্কে। উদ্দাম নাচের ফাঁকে এই নিয়ে বেশ কটা হয়ে গেছে। পার্ক স্ট্রিটের তন্ত্র বন্ধ হবে। রাত তেমন নয়। চাইছে আলো আঁধারিতে পছন্দসই কারও পাশে বসে ড্রিঙ্কটা শেষ করে তার সঙ্গেই রাতের ঠিকানায় বেরিয়ে পড়তে। কাউন্টারে বারস্টুলে বসে শেষ ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে থাকা কয়েক জনের মধ্যে একজনকে মনে ধরল। আগে এখানে দেখেনি। নাচের সময়ে ভিড়ের মধ্যেও নজরে পড়েছিল। নাচতে নাচতেই বারকয়েক জড়িয়েও ধরেছিল। তবে আর এগোয়নি।

বারস্টুলটা টেনে রিয়া ওর পাশে নিয়ে এল। ভডকার গ্লাসে চুমুক দিয়ে চোখ তুলল, 'হাই'

'হাই' সে-ও হাসল, 'নিশ্চয় সালসা জানো।'

'কী করে বুঝলে?'

'তোমার সঙ্গে স্টেপ মেলানো কঠিন হচ্ছিল।'

রিয়া ভডকায় সিপ করল, 'কারেক্ট', আরেকটা সিপ 'আমার আন্দাজ খুব খারাপ। মনে হয় এবার ভুল হয়নি।'

'না।'

কথোপকথন চালু রাখল 'রিয়া। তুমি?'

'রোশন। রোশন বাজপেয়ী।'

'অটলবিহারী বাজপেয়ীর কেউ বুঝি?'

'উঁহু। সব বাজপেয়ীরাই কী আত্মীয়?'

'বড্ড স্টাফি। শেষ ড্রিঙ্ক তো হয়ে গেছে। বেরোলেই হয়। আরেকটু হলেও মন্দ হয় না। এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাওয়ার মানেই হয় না।'

এ তো অলিভার নয়, ফ্যাগিনের দিকে পাত্র বাড়িয়ে চাইবে। ওর শরীরের খাঁজগুলো রোশনকে টানছে। কেনই বা সুযোগ নেবে না।

'প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে। চাইলে...'

'একটা কন্ডিশনে। মাল খাওয়াবে?'

'যত খুশি। রেডি ফর ইট ম্যা'ম।'

ফ্ল্যাটটা সাজানো-গোছানো। স্কিন-টাইট স্ল্যাক্স পরা রিয়া রোশনের লেদার সোফায় গা এলিয়ে বলল 'ভডকা আর ভাল্লাগছে না। সিঙ্গল মল্ট আছে?'

রোশন কিচেনে হাওয়া হল স্ন্যাক্স ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করতে।

রিয়ার মোবাইল বেজে উঠল 'মা, বলেই তো ছিলাম আজ রাতে ফিরছি না।' ফোন কেটে সুইচ অফ করে দিল।

দিনকাল বদলেছে। আগে বাবামায়েরা যা বলত বাচ্চারা শুনত। এখন উল্টে গেছে।

রোশন ফিরল হলদিরামের ভুজিয়া, গ্লেনমোর্যাঙ্গি নিয়ে। রাতটাকে রঙিন করতে সুপুরুষ রোশনকেই দরকার। শরীরটা সোফায় ছড়িয়ে দিল। ঠোঁটে ইন্ডিয়া কিংস। সাউন্ড সিস্টেমে রিচার্ড ক্লেডারম্যান। তন্ত্রের

প্ল্যাটফর্মে ডিজের কান ফাটানো হইহট্টগোলের পর কর্নার ল্যাম্পের আলো আঁধারি বেশ মনোরম, ঝিম ধরানো। এই তো জীবন! আসল খোলস ছেড়ে মাঝরাতের মাদকতাকে চাঙা রাখা। এই তো বেঁচে থাকা। একঘেয়েমি থেকে পালাও। খোঁজো বেঁচে থাকার নতুন নতুন রসদ। অন্য কোনও মানে। স্কুল ছাড়ার পর কেবল এটুকুর সন্ধানেই ছুটে বেড়িয়েছে। পড়াশোনা মানে সময় নষ্ট। বেঁচে থাকার আনন্দ কি আর ওর মধ্যে মেলে।

টেবলের বোতলটা নিয়ে সামনের অর্ধেক গ্লাসটায় আর একটা ডাবল ঢেলে মাথার নিচে কুশনটা টেনে নিল। রোশন পাশের ঘরে মোবাইলে কীসব বকবক করছে। নেশার ঘোরে রিয়ার কানে এলোমেলো কিছু ফিসফাস। বুঝতে পারছে না। চাইছেও না। তিন নম্বরে পৌঁছতেই মাথা ঘুরছে। উত্তেজিত। টপের বোতামগুলো কখন খুলে ফেলেছে। ছটফট করছে। রোশন ফোনেই ব্যস্ত।

আর কতক্ষণ!

দুজনেই জানে তারা কেন এখানে।

'রোশন...' ডাকল, 'কী করছ তখন থেকে?'

'আসছি' পাশের ঘর থেকে রোশনের গলা।

'আবার যেন ট্রাউজার পরেই এসো না। আর যে অপেক্ষা করতে পারছি না।'

'এলাম বলে।'

ব্লাডার ভর্তি। রিয়া উঠে পড়ল। টয়লেটে যেতে হবে। দরজা না লাগিয়েই স্ল্যাক্স-প্যান্টি নামিয়ে মুক্তি। পরিষ্কার করে অভিসারের জন্য তৈরি। রোশন অযথা সময় নষ্ট করছে। ওকে যে এখনই চাই।

আসন্ন ভোগসুখের উত্তেজনায় খেয়ালই করেনি কখন রোশন টয়লেটে। মাথাও কাজ করছে না। ততক্ষণে রোশন একটা ফাঁস ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছে। ফাঁসে টান পড়তেই দম বন্ধ হয়ে এল। কয়েক মুহূর্তে। চোখের সামনে কতগুলো তারা ঝলসে উঠল। তারপরই শরীরটা সিস্টার্নের ওপর আধশোয়া অবস্থাতেই গড়িয়ে পড়ল।

রোশন মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।

***

প্রায় এক ঘন্টা ধরে ভবানীপুর থানায় অপেক্ষা করছে দীপাঞ্জনা। ওসি আর তার জুনিয়াররা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রিটায়ারমেন্টের পরেও আইপিএলে দাদার ক্যারিশমা নিয়ে তর্কে মশগুল। পাত্তাই দিচ্ছে না।

'আমার ভাই দ্বৈপায়নকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি কি একটা এফআইআর করতে পারি?' শেষমেশ বিরক্তি লুকিয়ে খুবই ভদ্র গলায় জানতে চাইল।

ওসি সঙ্গীদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অরিন্দম, চট করে ওর এফআইআরটা নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।'

'ওকে খোঁজা...' । দীপাঞ্জনা জানতে চাইল।

'এফআইআরটা তো করুন আগে। তারপর দেখছি কী করা যায়।' ওসি নির্বিকার। টিভিতেই চোখ। অরিন্দম মিসিং ডায়রির খাতাটা টেনে নিয়েছে, 'আপনার ভাই কবে থেকে মিসিং?'

'গত তিন দিন বাড়ি ফেরেনি।'

'আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের কাছে খোঁজ নিয়েছেন?' অরিন্দমের গলায় নিঃস্পৃহতা, 'মানে, অনেক সময় তো হয়, গেছে হয়ত কারও বাড়ি, আর এদিকে... আমি এফআইআর নিয়ে নিচ্ছি। হপ্তা দুইয়ের মধ্যে না ফিরলে তারপর থেকে এনকোয়ারি শুরু করব।' লেখা শেষ করে একটা রেফারেন্স নাম্বার এগিয়ে দিল, 'আগে আপনারা নিজেরা নিশ্চিত হোন ছেলেটি হারিয়ে গেছে। তারপর... দু হপ্তা বাদে আসুন।'

'সে তো আমরা করছিই। আপনারা কী এ কদিন কিছুই করবেন না?'

'আপনাকে আনআইডেন্টিফায়েড বডির একটা লিস্ট দিতে পারি। এর থেকে বেশি এনকোয়ারি করতে সরকারের খরচ। নিশ্চিত না হয়ে কাজ শুরু করার মানেই হয় না। আশা করি বুঝতে পারছেন।'

থানা থেকে বেরোতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। চিন্তা করছিল তার ভাই কোথায় যেতে পারে। ছেলেবেলার সুখের স্মৃতিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল।

অরিন্দম আবার আড্ডায় ফিরে যোগ দেওয়ার আগেই ওসির ফোন বাজল, 'যে মেয়েটি এফআইআর করে গেল তার কেসটা যাতে আর না গড়ায়।'

'সিওর স্যার।' ওসি বলল।

অরিন্দম শুনলেও বুঝে উঠতে পারল না ওসির সঙ্গে কে কথা বলল।

এখন দাদার দিন। ফালতু লাফড়া গোলি মারো।

***

মিঙ্ক কোটেও জেসিকা যে কেঁপে যাচ্ছে সেটা শীতে না উর্নার অ্যাল্পসের গ্লেসিয়ারের প্যানোরামিক ৩৬০ ডিগ্রি ভিউয়ের জন্যে, বুঝতে পারল না। মাউন্ট টিটলিসের ওপর এই রোপওয়ের মাঝামাঝি এসে পড়ার থ্রিলও সমান তালে কাজ করছে। শিরশিরে একটা অনুভূতি পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। যদিও সে রোটায়ার বেসমেন্ট স্টেশন থেকে ইন্টারন্যালি হিটেড কেবল কারে। রোপওয়েতে পঁয়তাল্লিশটা পাহাড়চূড়ার ওপর দিয়ে এই রাইডের ঠিক মধ্যপর্বে। বিনোদ কারাত নিচের পাহাড়ের মধ্যেখানে কিছু দেখছে। এরকম একজন বিখ্যাত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার অঙ্কশায়িনী হয়ে জেসিকা রীতিমতো সৌভাগ্যবতী। বান্ধবী নিয়ে এটা নিছক বিদেশ ভ্রমণ নয়, বলা যায় বিশ্রাম। দেশের বাইরে এত দূরে বউ কিংবা দলের ছিনেজোঁকেদের পক্ষে নেতার পিছু নেওয়া সম্ভব নয়।

বিনোদ জিগ্যেস করল, ' কী ঠিক করলে?'

জেসিকা কী একটা করছিল, ফিরে তাকিয়ে বলল, 'যা বলবে। তোমার যা ইচ্ছে...'

'তোমার, কেবল তোমার জন্যেই এখানে আসা। ছাড়ো, আমিই দেখছি...' জেসিকার ঠোঁটের ভঙ্গিমা থেকে বিনোদ চোখ ফেরাতে পারছে না।

বিনোদ কারাত অবিশ্যি ওকে পুরো কথা বলেনি। ফুর্তি করতে এসেছে বটে, তার সঙ্গে আরও অন্য কিছু। জেসিকার অবিশ্যি সেসব জানার কথা নয়।

'ফিশ অ্যান্ড চিপসই এখানে ঠিক। সঙ্গে ব্র্যান্ডি থাকলে...' প্রশ্রয়ের হাসি জেসিকার লোভনীয় ঠোঁটে।

বুঝতে পারছে জেসিকা কোনদিকে ইঙ্গিত করছে। বিদেশিদের মতো নিজের আবেগ ওভাবে খোলাখুলি প্রকাশ করতে পারে না। তার ভারতীয় মানসিকতায় কোথায় যেন বাধে।

কদিন হল ওরা জুরিখ এয়ারপোর্টে এসে নেমেছে। সেখান থেকে একটা হার্টজ কার রেন্টাল নিয়ে সোজা সেন্ট্রাল সুইজারল্যান্ডের লেক লুসার্নে। দেশের মধ্যে সবথেকে বড় লেকের মধ্যে এটা চার নম্বর। এমনিতেই সুইজারল্যান্ড খরচের জায়গা। হালচাল দেখে জেসিকা অবাক হয়ে ভেবেছে এরকম ভারতীয় নেতারা এত খরচের ধাক্কা সামলায় কী করে! এসব দিকে অবিশ্যি তার মাথা ঘামানোর কথা নয়। এই লোকটার কটা দিনের সঙ্গিনী মাত্র। তার সৌভাগ্য যে এর মধ্যে ইয়োরোপ, অ্যামেরিকা, হাওয়াই, মালদ্বীপ, রিও-ডি-জানেইরো কারনিভাল সহ দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের খান কয়েক দ্বীপের মতো বেশ কয়েকটা দারুণ খরচের, বিলাসবহুল জায়গা ঘোরা হয়ে যাচ্ছে। সুইজারল্যান্ড, বিশেষ করে এখানকার এইসব লেক অঞ্চল এমনিতেই তার স্বপ্নের জায়গা - তা সে জুরিখ, ডেভস, বা লেক লুগানোয় চাঁদনি রাতই হোক। যদ্দিন না ক্ষমতায় কুলোয় তদ্দিন কে আর এসব নিয়ে মাথা ঘামায়?

স্রেফ বিনোদের ফুর্তির সঙ্গী হয়ে এখানে। ও এমনিতে মনের দিক থেকে যথেষ্টই লিবার্যাল। কী নেই তার? সুন্দর মুখ, লোভনীয় শারীরী বিভঙ্গ - অভাবটা কোথায়? হাতের মধ্যে যা যা এসে পড়বে, সাপ্টে নেবে না-ই বা কেন? বিনোদ অবিশ্যি লেকের ধারে খামোকা বসে উপভোগ করার পাত্র নয়। এসব হলিউডি

সুপারস্টারদের ভিড় থেকে একটু আলাদাই থাকতে পক্ষপাতী। যত লোকের নজর এড়ানো যায় ততই ভালো। বরং জেসিকার সঙ্গে আলাদা নিজের মতো সময়টাকে উসুল করে নেওয়াই পছন্দ। তাই লেক লুসার্নের ধারের গ্যাঞ্জাম থেকে দূরে বুকিং। লুসার্ন থেকে মিনিট পনের দূরে সুইশ কায়দার এই কাস্তানিয়েবাম কোয়ালিটি সী হোটেলে। মাঝেমধ্যে ভেবে অবাক লাগে, কেন তাকেই এ জন্যে বাছা। ভারতে তো আর তার মতো লাস্যময়ী মেয়ের অভাব নেই। তাহলে? হয়ত তার এই-সেই নিয়ে ফালতু মাথাব্যথা নেই বলেই ভাগ্যে শিকেটা ছিঁড়েছে। যা পেয়েছে সেটাই আসল। কীভাবে পেল, কেন পেল এসব নিয়ে মাথা খারাপ করে লাভ?

'তুমি যেমন বলবে।' বিনোদ ওয়েটারকে খুঁজছে।

ফনডু বোটে কাল রাতের ক্যান্ডললাইট ডিনার ক্রুজ একটা স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ট্যুরিস্ট ভরা এই শহরের অন্য চেহারাও দেখা হয়ে গেছে।

বিনোদ বলল, 'এইসব বাইরের ট্রিপগুলোই যা একটু সান্ত্বনা। নইলে পলিটিশিয়ান হওয়ার ঝামেলা পোয়ানোর কোনও মানে হয়। তার ওপর এবার তুমি সঙ্গে। গ্রেট।'

যারা রাজনীতি করে তাদের দুমুখো চরিত্রের সঙ্গে জেসিকার যথেষ্ট পরিচয়। এরা মিডিয়ার সামনে গরিবদের কথা বলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, গরম গরম ভাষণে উত্তেজিত করে। বাস্তবে নিজের ধান্দা ছাড়া কিছুই নেই। রোম তো আর একদিনে তৈরি হয়নি। রাজনীতি যারা করে তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বানায়। ছেলেপুলেদের আরামে থাকার বন্দোবস্ত করে যায়। যতখানি পারে দুনিয়ার সমস্ত ফুর্তি চেখে নেওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তা-ই করে যাবে। কে জানে ভবিষ্যতে কী হবে, কোথায় থাকবে। তার থেকে এখন যেটুকু হাতে পাচ্ছে তার সদ্ব্যবহারই ভালো। চেখে নাও, দুদিন বই তো নয়।

ডম পেরিনো স্যাভয়-ফেয়ারে চুমুক দিয়ে আলতো করে বিনোদের হাত ছুঁল, 'আমার একটা সাধ কিন্তু এখনও পূরণ হল না। কবে যে হবে।'

'কী?'

'আসল হিরে বসানো একটা প্ল্যাটিনামের সেট।'

বিনোদের আঙুলগুলো তার হাতে খেলে বেরাচ্ছে, 'নিশ্চয়ই। তুমি যা চাও কোনওদিন না দিয়ে থেকেছি'

বিনোদ কী চায় বুঝতে পারছে জেসিকা। রাতের জন্যে তৈরি। সে তো তাকে খেলা করতে নিয়ে আসেনি। চায় বুনো ঘোড়ার মতো কাম বাসনাটুকু নিংড়ে ভোগ করতে। যা চায় জেসিকা দিতে প্রস্তুত।

সুইশ কোয়ালিটির কাস্তানিয়েবাম সী হোটেলে ফেরার সময়ে জেসিকাকে হোটেলের দরজায় নামিয়ে দিল বিনোদ, 'রাত তো এখনো হয়ইনি। একটু আরাম করো, একটা ঝামেলা মিটিয়ে আসছি'

গাড়িটা নিঃশব্দে উধাও হয়ে যেতেই জেসিকা পায়ে পায়ে ভেতরে। রিসেপশন থেকে নিজেদের স্যুইটের চাবিটা নেবে বলে।

পাবটা নির্জন না হলেও বেশ শান্তই। বিনোদ এসেই নিজের আর জন গর্ডনের জন্যে দুটো ডাবল স্কচ অর্ডার দিয়েছিল। টেবলে পানীয় আসতেই জন ড্রিঙ্কে মন দিল, 'মনে হচ্ছে হয়ে যাবে।'

'কোনও সন্দেহ আছে? যেখানে টাকা সেখানে আমায় পাবেই। টাকা ছাড়া জীবন যে ফাঁকা - এই আমার জীবনের মোটো।' হাসল বিনোদ, 'সুইশ ব্যাংকে কত ট্র্যান্সফার করেছ?'

'কাজ চালানোর জন্যে যথেষ্ট। বলেইছি তো টাকাটা কোনও ফ্যাক্টর হবে না। কাজটাই আসল।'

বিনোদের তবু দ্বিধা। খুব ভালো করেই জানে জানে যা লাগে জন দিতে তৈরি। ভাবছে শুধু কাজটা নিয়ে। রাজনীতিতে বড় খেলোয়াড় হিসেবে এরই মধ্যে কিছু শত্রুও বানিয়েছে। কাজটা নামানো কীভাবে? নিজের রাজনৈতিক ইমেজে কালিও পড়বে না আবার জনের কাজটাও নামিয়ে দিতে হবে - এটাই চ্যালেঞ্জ। এই রিস্কের জন্যে এক মিলিয়ান ডলার। কীভাবে কী করা যায় ভাবতে ভাবতেই গ্লাসে চুমুক দিল। আর-সমস্ত

রাজনীতির খেলোয়াড়দের মতোই নিজের দুর্বলতা আড়াল করে জনকে বোঝাতে হবে এটা কোনও সমস্যাই নয়।

'জন... যদি একটু সময় নিই...' বিনোদ ওর প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে চাইল।

'আমরা নিইনি। যেমন চেয়েছ অ্যাডভান্স ডলার পৌঁছে দিয়েছি। চেক করে দেখে নাও। আমাদের কাজ শেষ। কিন্তু শুনব কেন? কাজটা চাই, ব্যস।'

বিনোদ বিলম্বিত করতে চাইছিল, বৃথাই। জনের মতো লোকেরা প্রফেশনাল। আর কিচ্ছু বোঝে না, কেবল কাজ চায়। এখন বিনোদেরও পিছোনোর উপায় নেই। নিজেকে জনের হাতে তুলে দিয়েছে।

ড্রিঙ্ক শেষ। জন উঠে দাঁড়াল। পেছন ফিরে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে চিন্তায় আছো। যাক গে, তাড়াতাড়ি করো।'

কথা শেষ করেই বেরিয়ে গেল।

বিনোদ হোটেলে ফিরে দেখল জেসিকা রাতের জন্যে তৈরি। সিল্কের নাইটির নিচে অন্তর্বাস রাখতে না-পসন্দ। তার ওপর, এখন রাতের অভিসারের সময়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। নাইটির সামান্য আড়াল ভেদ করে ওর স্তনযুগল বিনোদকে আহ্বান করছে। পেছনে দাঁড়িয়ে স্তনে হাত দিতেই, আয়নায় তাকিয়ে বলল, 'দেখা হল তোমার লোকের সঙ্গে? তোমার জন্যেই এতক্ষণ বসে।'

হাতটা সরিয়ে বিনোদ কোটটা ক্লোজেটে ঢুকিয়ে বলল, 'জানি।' চটপট শার্ট আর ট্রাউজারটা খুলে হ্যাঙ্গারে।

জেসিকা আয়নার মধ্যে দিয়েই ওর রোমশ বুকের দিকে একবার তাকিয়ে নিল। গা শিরশির করছে। বিনোদের ঠোঁটে হাসি। কী ভাবছে কে জানে। রাজনীতির লোকগুলো কখন যে কী ভাবে, কী বলে, তা আন্দাজ করা অসম্ভব। বিনোদ যে চিন্তিত তার ভাবভঙ্গিতেই প্রকট। জেসিকার গলার স্বরে যেন আন্দাজটা বেরিয়ে না আসে সেদিকেই নজর।

'অন দ্য রকস?' সিঙ্গল মল্ট লাগাভুলিনের দুটো পেগ ভরে টেবলে। রাতের ধকলের আগে অবশ্যই আবশ্যক। না হলে মেজাজটা আসবে কী করে? এই লোকটা বিছানায় মেয়ে পেলেই যেমন চঞ্চল হয়ে দাপাদাপি শুরু করে দেয় তা সামাল দিতে বাড়তি ক্ষমতাটুকু তো দরকার। এখন তাই সংগ্রহে নিমগ্ন।

'বেশি বরফ দিও না। টেস্টই চলে যায়' কাপড় ছেড়ে খোলা গায়ে বিনোদ টয়লেটে। বেরিয়ে দেখে নগ্ন জেসিকা সোফায় গা এলিয়ে স্কচে চুমুক দিচ্ছে। নজর বিনোদের নিম্নাঙ্গে।

'চিয়ার্স' বিবস্ত্র বিনোদ গ্লাসটা তুলে নিল।

উলঙ্গ অবস্থায় প্রথম ড্রিঙ্ক। নতুন ফোরপ্লে। যদিও জেসিকার পরিপূর্ণ স্তনযুগল উদ্ধত, মাথা থেকে জনের শেষ কথাগুলোও সরিয়ে ফেলা যাচ্ছে না। শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা শিরশিরানি। রক্তে বুড়বুড়ি। মাথা থেকে ওই চিন্তা সরাতে বড় স্কচে চুমুক দিল। আগামী ডাবলটাও গ্লাসে ঢেলে ফেলল।

'আজ তাড়াতাড়ি খাচ্ছ?' জেসিকাও দেখছে। কোনোদিন এমনভাবে নজর করে না। ভালোই জানে তার ন্যাংটো শরীর দেখলেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আজ রাতে ওকে উত্তেজিত করতে কসরত লাগবে।

জেসিকা বরফজমা পাহাড়চূড়াগুলোকে ভালো করে দেখার জন্যে রেলের দিকে এগোচ্ছে, তার অজান্তেই দুটো চোখ তাকে লক্ষ্য করছে। রেলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে রেস্তোরাঁর দেয়ালে ভর দিয়ে সামনের সুরম্য প্রকৃতির ছবি তোলার জন্যে ইশারায় বিনোদকে ডাকল। ও আসতেই দেওয়ালে পিঠ রেখেই বলল, 'আমার একটা ছবি তোলো না প্লিজ...' সুইশ অ্যাল্পসের মোহ ধরানো প্রকৃতিকে পেছনে রেখে ছবি চাওয়াটা স্বাভাবিক।

'নিশ্চয়', বিনোদ রেলে ভর দিয়ে ফোকাস করতে অন্যমনস্ক। রেলটা তৎক্ষণাৎ আলগা হতেই আতঙ্কে হাত থেকে ক্যামেরাটা ছিটকে পড়ল। পরক্ষণেই জেসিকা দেখল বিনোদের দেহটা তীরের মতো ছিটকে

অ্যাল্পসের গহীন পর্বত কন্দরে বিন্দুর মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ে আতঙ্কে রেল থেকে তাড়াতাড়ি সরে এল। কী হল প্রথমটা বুঝতে পারেনি। পরক্ষণে বুঝেই হিম। বিনোদ আর কোনোদিনও ফিরবে না।

***

সাদা পায়জামার মতো থোক্র-দাম আর ইয়েন্থাতসে শার্টের ওপর জরাজীর্ণ কোট গায়ে অন্ধ বৃদ্ধটি জীর্ণ কাঠের শেলফ হাতড়াচ্ছিলেন। নিশ্চিত, ওগুলো এখানেই রেখেছিল। বুড়ো হলেও পাঞ্চেত জোংপার স্মৃতি এখনও বিস্মৃতি হয়নি। এই পঁচাত্তরেও মস্তিষ্ক চল্লিশ বছরের মতোই সজাগ। পরিষ্কার মনে আছে বয়েস যখন খুবই কম এই মনাস্টেরিতে পা রাখল। বাবা দক্ষিণ সিকিমের দরিদ্র শ্রমিক। ওকে ওর পূর্বসূরী করমপা লামার হাতে তুলে দেয়। জন্ম থেকেই অন্ধ ছেলেটির বড় হয় কারমপার এই মানাস্টেরিতে। খাওয়া, মাথার ওপর ছাদ ছাড়াও সংস্পর্শে আসে মহাযান পন্থায় করমপা লামার তত্ত্বাবধানে দীক্ষাত হয় মানবিকতার সত্যে। জন্ম থেকেই অন্ধ হওয়ায় পড়াশোনার সুযোগ পায়নি। মানবিকতার সত্যই তার সম্পদ।

বাদামি পাথরের স্তরে গাঁথা মনাস্টেরিটি আগে ছিল নীল টিনের ছাউনি দেওয়া একটা কুটির মাত্র। রুমটেক বা অন্য সব মনাস্টেরির মতো জমকালো নয়। গ্যাংটক থেকে ১১৭ কিমি দূরে পশ্চিম সিকিমের গেইঝিং শহরের বাইরে কিছু দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেন্ট মেরিজ কনভেন্টে যাওয়ার পথে একটা ছোট রাস্তা বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেছে। এমনিতে সেই পথে হাঁটা সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হলেও পাহাড়ি এলাকায় চলতে যারা অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে এই পথ দুর্গম নয়। এই জঙ্গলের পথেরই মাঝ বরাবর এক চড়াইয়ের ওপর এই অখ্যাত মনাস্টেরিতে সচরাচর কেউ আসে না।

পাঞ্চেত জানে না করমপাই প্রথম কি না যে ওই ছোট্ট কুটিরকে মনাস্টেরি আখ্যা দেয়। নিজের মনে এই জনমানবহীন জায়গায় দিন কাটিয়েছে। করমপার কাছ থেকে গৌতম বুদ্ধের যে শিক্ষার পাঠ নিয়েছে তাকে অনুসরণের চেষ্টা করেছে। জীবনের প্রকৃত সত্য আত্মস্থ করা সহজ নয়। আগে বাইরের সঙ্গে এখানের যোগাযোগের উপায় ছিল একমার রেডিও। এখন তার সঙ্গে জুড়েছে একটা সেল ফোন। রেডিওয় চ্যানেল সার্ফ করতে করতেই জেনে নেয় দুনিয়ায় কোথায় কী হচ্ছে। সেই কবে, ছেলেবেলায় বার দুই ঘুমে গিয়ে দালাই লামার বক্তৃতা শুনে আসা বাদে আর কোথাও যায়নি। চির অন্ধ একজনের কাছে বেড়ানোর কোনও অর্থও নেই। তা-ই নিয়ে কোনও দুঃখও নেই। সবকিছুকে পর্যবেক্ষণ করে অন্তরের দৃষ্টিতে। ঈশ্বর যখন একটা অঙ্গ নিয়ে নেয়, অন্যগুলোয় বাড়তি ক্ষমতা দিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়।

যা খুঁজছিল অনেক খুঁজে এক সময় পেয়ে গেল। পাত্র একটা। গুরুদেব মারা যাওয়ার আগে দিয়ে গিয়েছিল, 'যখনই দোটানায় পড়বে এটা হাতে নিয়ে ধ্যানে বোসো। জবাব পেয়ে যাবে'

সাম্প্রতিক সময়ে চারদিকে যা যা ঘটছে তার সমাধান খুঁজছিল।

বহুদিন আগে একদিন সকালে স্নান সেরে ছাত্র পড়াচ্ছে, এমন সময় একটি লোক তার মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির। প্রথমে অবাকই হয়েছিল। কী করে জানল এই জায়গার কথা? বসার জন্যে টুল এগিয়ে দিয়েছিল।

মানুষটার পোশাক-আশাক যথেষ্ট ঝকঝকে, দামি। নিচু গলায় অভিবাদনের সুর, 'ওম মণিপদ্মে হুম।'

ইতিমধ্যেই ছাত্রদের আপাতত ছুটি দিয়ে দিয়েছে ভাবছিল গৌতম বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিতের আমলে কেমনভাবে অচিরাবতী নদীর ধারে সাহেত আর মাহেত নামে দুটি জনপদে এক হাজারটা পদ্মের ওপর ২৪ বছর অবস্থান করেছিলেন। যে জায়গার নাম আজ শ্রাবস্তী।

হাসিমুখে ওদের সামনের কাঠের টুল দেখিয়ে বলল, 'এখানে?'

'আমি দিল্লির অ্যালবার্ট চৌধুরী। এ আমার মেয়ে এলেনা।'

এলেনার মা মারা গেছে। সংসারে মেয়েকে নিয়ে সে একা। ব্যবসার ব্যস্ততায় অ্যালবার্টের পক্ষে মেয়েকে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়ে ওঠে না। মেয়েটি ইন্ট্রোভার্ট। সমবয়েসী সামাজিক বৃত্তে খাপ খাওয়াতে পারছে না দেখে বাবা ঠিক করল দূরের কোনও বোর্ডিং স্কুলে রেখে সামাজিক বৃত্তের বাইরে আত্মিক পরিশুদ্ধির পরিবেশে মানুষ করবে। কিন্তু তাতে মন কি মানে। তা ছাড়া মেয়েকেও তো সমাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে।

মাঝেমধ্যেই সেন্ট মেরিজ কনভেন্টে এসে এলেনাকে দেখে যায়। অনেক সময় ওকে নিয়ে সিকিমের নানান দ্রষ্টব্য জায়গায় ঘুরিয়েও আনে। এভাবে তাকে নিয়ে ছাঙ্গু লেক, রুমটেক মনাস্টেরিতেও ঘুরে এসেছে। লক্ষ করেছে মেয়েটি মাঝেমধ্যেই কীরকম গুটিয়ে যায়। জঙ্গলে গিয়ে নিঝুম হয়ে বসে থাকে। এরকমই একবার ঘুরতে বেরিয়েই এই মনাস্টেরিটির নাম শুনেছিল।

'মেয়েটা বছর কয়ক আগে মাকে হারিয়েছে। যখনই সময় পাই ওর কাছে ঘুরে যাই। সঙ্গে সময় কাটাই। কাছেই সেন্ট মেরিজে পড়ে'

কাছেই জঙ্গলের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রকে ঘোরাফেরা করতে দেখে এলেনা জিজ্ঞেস করল, 'ওদের সঙ্গে খেলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। যাও'

'এখানে একাই থাকেন?' অ্যালবার্ট জানতে চাইল।

'একা না, ছাত্ররাও আছে। ছাত্র মানে কাছের গ্রামে থাকে। মঙ্ক হওয়ার তালিম নিতে আসে। সাহায্যের জন্যে কাঞ্ছাও আছে।' একটু থেমে বললেন, ' কাঞ্ছা, চা বানাও'

'একা স্কুল চালান?'

'না, ঠিক তা নয়। এরা এত গরিব যে এদের স্কুলে যাওয়ার পয়সা নেই। ওদের মূল্যবোধ নিয়ে একটু শিক্ষা দিই'

অ্যালবার্ট লক্ষ করল তার মেয়ে বাকিদের সঙ্গে দিব্যি খেলছে। বুঝতে পারছে এলেনা এখানকার প্রকৃতির মধ্যে শান্ত পরিবেশ পছন্দ করে ফেলেছে, যা স্কুলে পায় না। এখানে তাই আনন্দে। পাঞ্চেতের দিকে ফিরল, 'ও যে এখানে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে এটা কম নয়।'

পাঞ্চেত হাসছে, 'প্রকৃতির সৌন্দর্য ওকে টানছে'

স্কুলের বেষ্টনীর বাইরে এই অকৃতিম প্রকৃতির কোলে যেখানে প্রজাপতিরা খেলে বেড়ায় মুক্ত আকাশে, যেখানে পাতায় জমে থাকে শিশিরবিন্দু, সেখানে যেন নির্মল আনন্দ যা সেন্ট মেরিজ কনভেন্টে নেই। প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারছে।

'কেবলই ভাবি কোথায় ও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। মনে হয় এখানে ভালোই থাকবে।'

খেলতে খেলতে ক্লান্ত এলেনা ফেরেত এসে বাবার কোলে মাথা এলিয়ে দিল।

'ক্লান্ত?' ওর চুলে হাত বুলিয়ে পাঞ্চেত জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ' লাজুক মুখে উত্তর দিল মেয়েটি।

পাঞ্চেত কাঞ্ছার আনা মোমোর পাত্রটা ওর হাতে দিয়ে বলল, 'খিদে পেয়েছে তো। খেয়ে নাও। '

'এটা কী?'

'মোমো। আমরা এখানে খাই'

এলেনা যখন আস্তে আস্তে চিবোচ্ছে অ্যালবার্ট বলল, 'ওকে এখানে খুব খুশি দেখাচ্ছে।'

পাঞ্চেত জোংপা কাঠের থামে হেলান দিয়ে বসে, 'ও যে প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির কোলেই ওর শান্তি।'

***

শরীরে রাইগার মর্টিস শুরু হয়ে গেছে। বডিটা ফুলে উঠে পচতে শুরু করেছে। কয়েকদিন আগে নিশ্চয়ই মেয়েটা মরেছে। প্রতিবেশীরা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিসে খবর দিয়েছিল। তারা এসে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটার

টয়লেট থেকে একটি মেয়ের বডি উদ্ধার করে। মৃত্যুর তদন্তে ফরেন্সিককে ডাকা হয়। বডিটাকে পোস্ট মর্টেম করতে পাঠানো হয়।

থিয়েটার রোড থানার ওসি সুবিমল ব্যানার্জি মেয়েটির, ফ্ল্যাটের মালিকের পরিচয় বার করার চেষ্টা করছিল। ততক্ষণে ফ্ল্যাটের বাইরে অন্য সব ফ্ল্যাটের লোকেদের বড়সড় ভিড় জমে গেছে। তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই ফ্ল্যাটের মালিক কে?'

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন মাঝবয়েসী লোক এগিয়ে এল, 'আমি ফ্ল্যাট ওনার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। মালিক মি. কানোরিয়া এখানে থাকেন না। ভাড়া দিয়েছিলেন। এখনো ভাড়া ছিল কি না বলতে পারব না। চেক করে দেখতে হবে। বেশ কয়েকদিন এখানে কাউকে দেখা যায়নি। দাঁড়ান, মি. কানোরিয়াকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিচ্ছি'

'মেয়েটাই বা কে?'

'বলতে পারব না। কখনো দেখিনি।'

সময় নষ্ট করল না সুবিমল, 'মি. কানোরিয়ার নম্বরটা দিন।'

'রেকর্ডে আছে। দিচ্ছি। অফিসে আসুন'

ফ্ল্যাটে ফের ঢোকার আগে সুবিমল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম?'

'রাজীব খৈতান।'

ততক্ষণে ভেতরে ফরেন্সিকের লোকেরা নিজেদের রুটিন কাজে লেগে পড়েছে। সুবিমল মেয়েটির হ্যান্ডব্যাগ ঘাঁটল। একটা ছোট আয়না, কয়েকটা লিপস্টিক, হাজার টাকার নোটের একটা বান্ডিল, খান কতক একশো টাকার নোট, কয়েকটা কন্ডোম, এক ফাইল ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ। এর থেকে মেয়েটার পরিচয় বার করা মুস্কিল। পরিচয়টা তো চাই। বেশ্যা? জামা-কাপড় তো বলছে ভালো ঘরেরই।

বাথরুমে যে ফরেনসিকের লোকটি ব্যস্ত ছিল সে বেরিয়ে এসেছে, 'একটা দড়ি ব্যবহার হয়েছে, ফাঁস দেওয়ার জন্যে। খুনি ফাঁসটা সরাতেও চেষ্টা করেনি।'

'কারও ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'খুঁজছি।'

সুবিমল ওদের কাজ করতে দিয়ে কিচেন সুদ্ধ অন্য ঘরগুলোয় উঁকি মারল। কেউ যে এখানে থাকত তার প্রমাণ একমাত্র লাউঞ্জেই। একটা অর্ধেক শেষ গ্লেনমোরাঙ্গির বোতল, টেবলে ছলকে পরা হুইস্কি সুদ্ধ গ্লাস ভুজিয়ার প্লেট। একটা ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট। বোধহয় হুইস্কির সঙ্গে সিগারেট খাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছে না সঙ্গে কেউ ছিল কি না। এ-ই কি কানোরিয়ার কাছ থেকে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিল? হতে পারে। তাহলে কি এর পরিচিত কেউ ঢুকেই আচমকা... কোনও ক্লায়েন্ট? তাহলে কি ফ্ল্যাটটাকে ধান্দার জন্য ব্যবহার করা হত? হতেই পারে।

যেটুকু ক্লু পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে পরিষ্কার করে কিছু বলা কঠিন। ফরেন্সিকের লোকেরা হয়ত খুনের ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারবে। কিন্তু ওকে তো ওর পরিচয়টা অন্তত বার করতে হবে। অন্ধকারে থাকা অবস্থায়ই, দ্বিতীয়বারের জন্যে মেয়েটার হ্যান্ডব্যাগ টেনে নিলেও নতুন কিছুই আলোকপাত হল না। কানোরিয়া হয়ত বলতে পারবে। রাজীব খৈতানের খোঁজে যেতে যেতেই বিদ্যুতের মতো একটা কথা মাথায় খেলে গেল। সোফার কাছে ফেরত এল। আগে নজরে পড়েনি। কোনে একটা মোবাইল পড়ে। এর থেকেই খোঁজ মিলতে পারে। সুইচড অফ মোবাইলটা অন করল। লক করা। আনলক করতে এক্সপার্ট লাগবে।

হয়ত তদন্তের শুরু এর থেকেই।

***

রেইনর স্মেলঝাইসেন শেখ আলঘানিমের দিকে তাকাল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

চারজন দুবাইয়ের জুমেরিয়া বিচ থেকে সামান্য দূরে আর্টিফিসিয়াল একটি দ্বীপে বুরজ আল আরব হোটেলের ৮৪০০ বর্গফুট একটি স্যুইটে। সমুদ্রের বুকের মধ্যে এটাই চারটি সবথেকে দামি উঁচু হোটেলের অন্যতম। শেখ আলঘানিম তার আরবি ইংরেজিতে বলল, 'তাহলে রেইনর, আমরা কিন্তু সত্যিই কোথাও পৌঁছোচ্ছি না।' মার্ক হেনরি ক্রিস্টালের ডিক্যান্টার থেকে তার প্রিয় দ্য ম্যাকালান ৬৪ বছরের লালিক ঢালছিল। সরু গলা, ছ্যাতরানো, অনেকটা উল্টোনো ফানেলের মতো বেঁটে বোতল মার্কিন ডলারে ৪৬০,০০০ দাম। যতই মহার্ঘ্য হোক না কেন, ব্রিটেনের ডালউইচ ভিলেজের বাসিন্দা মার্কের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। এমনকি দেশের অর্থনীতি তলানিতে ঠেকলেও ব্যক্তিগত অর্থনীতির কাছে তুচ্ছই। তার দীর্ঘদিনের জার্মান বন্ধু রেইনর অক্সফোর্ডের বন্ধুদের একটা গেট টুগেদার ডেকেছে। ডেভিড ডাল্টন ওর হাতে এডিনবরা ক্রিস্টালের গ্লাসটা তুলে দিল, 'ঠিক বলেছ রেইনর। গোটা দুনিয়াটাই যেন একটা আগ্নেয়গিরি। তার ওপর আমরা অ্যামেরিকানরা প্রাকৃতিক নানান দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত।' ইঙ্গিতটা লুফে নিয়ে রেইনর বলল, 'জার্মানিতে অবিশ্যি আমরা ঠিক অতটা ভুগছি না। থার্ড রাইখের পতনের পর ইনফ্লেশন পার ক্যাপিটা ইনকাম ছাপিয়ে গেছিল। এখন ইইসি-তে ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সমান হতে হবে। যেগুলোর অবস্থা ভয়াবহ। পূর্ব জার্মানির একত্রীকরণের পর আবার রিফিউজি সমস্যাটাও দেখা দিয়েছে।' ডেভিডের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'গোরবাচেভ ভবিষ্যতবাণী করেছিল কমিউনিজম ধ্বসে যাবে। তাই হল। আমাদেরকেও সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

শেখ আলঘানিম টেবলের ওপর তার সিওপিডির জন্যে একটা ক্যাপসুল রাখল। মার্ক জানতে চাইল, 'এটা কী?

'অনেকদিন ক্রনিক অবস্ট্রাক্টিভ এয়ারওয়ে ডিজিজে ভুগছি। ড্রিঙ্কে বসার আগে সামনে বার করে রাখি যাতে ভুলে না যাই' ক্রিস্টালের গবলেট থেকে ডোমেইন দ্য লা রোমানি-কন্টি গ্রাঁদ ক্রু, কোতে দ্য নুইটে চুমুক দিয়ে শুরু করল, 'আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। মিডল ইস্টে এই যে অস্থিরতা, সেই সুযোগে অনেক পাওয়ার গ্রুপই নিজেদের ভেস্টেড ইন্টারেস্টে আমাদের তেল-অর্থনীতি মুঠোয় আনতে চাইছে। কী করে যে এদের ঠেকানো যাবে ভাবতে ভাবতে আমাদের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ডেভিডদের মতো আমরাও ওদের লক্ষ্য।'

পাব্লিক স্কুলের মার্কামারা ব্রিটিশ মার্ক চুপচাপ বসে। সিঙ্গল মল্টে মৌজ করে চুমুক দিচ্ছে। ব্রিটেনের এখন সূর্য অস্ত। ঐতিহ্য বাদে কিচ্ছু বোঝেও না, বুঝতে চায়ও না। অ্যামেরিকা যা ভাবে ব্রিটেনকেও তাই করতে হবে। ওদের কে বোঝাবে ঐতিহ্য আর বিবর্তন কখনো হাত ধরাধরি করে চলে না। তার মধ্যে বেছে নেওয়ার ব্যাপার নেই। তাদের ক্যাপিটালিস্ট পন্থাই অনুসরণ করতে হবে। সোস্যালিজম নিয়ে তার ধ্যানধারণা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ক্ষমতা দখলে পৌঁছে যাওয়ার পর আপাতত ডকে। চুপচাপ মল্টে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। একজন ব্রিটিশ হিসেবে ভালোই জানে কখন মুখ খোলা দরকার, কখন নয়। নৈঃশব্দের নিজস্ব একটা ভার আছে। সে নিজের ভার, গর্ব, নীল রক্তের গরিমায় আচ্ছন্ন। কোনও ইজমের ক্ষমতাই নেই নীল রক্তের গরিমা মুছে দেয়। দুনিয়া জোড়া বৈষম্যের আঁচ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। নিজের শ্রেণির আশ্রয়ই সেরা আশ্রয়। তার গর্ব, অহংকার, মর্যাদার ভার। চতাতেই বাঁচতে চায়। যেহেতু পুরনো বন্ধুদের পুনর্মিলন, সেই অক্সফোর্ডের দিনগুলোয় ফিরে যাওয়াই শ্রেয়।

'তখন এসব ভাবার বয়েসই হয়নি। হয়ত ভেবেছি, যদিও কত ইমম্যাচিওর ছিলাম। কতদিন হয়ে গেল' ডেভিড বলল।

'ভেবেছি কী?' রেইনর বলল।

'হ্যাঁ' আলঘানিম তার প্রিয় ড্রিঙ্কে চুমুক দিল, 'বিশ্বাস মানুষকে এগিয়ে নেয় না। নিজের মতো করে সব জমানারই শেষ আছে।'

‘তবু ছাড়া তো যায় না। পুরনো দিনগুলোর কথাই ভাবা যাক। আমাদের সেদিনের বন্ধুত্ব আজও আটুট। সাকসেসফুলও। লেটস ড্রিঙ্ক টু গুড ওল্ড ডেইজ’ মার্ক বলে উঠল।

রেইনর ছড়িয়ে বসল। ড্রিঙ্ক নিয়ে জানলার বাইরে আরব উপসাগরের অন্ধকার বুকের দিকে তাকিয়ে। দূরে জুমেরিয়া বীচের আলোগুলো ঝিকমিক করছে, ‘ঠিক। বরং পুনর্মিলন উদযাপন করি’

নিজের কৃতিত্বের বাইরে একজন ভাবছিল। নিজের সাফল্যই মুখ্য নয়। যখন গোটা দুনিয়া বিশৃঙ্খলায় একতা, শান্তি, মিলেমিশে থাকাটাই বড় কথা। বিশ্বের অগ্রগতিতে কিছু যোগ করাই মুখ্য। বিশ্বে অবদান ছাড়া সে ব্যর্থ।

সামনে তাকিয়ে আগামীর চিন্তায়।

***

‘আপনিই কী এই ফ্ল্যাটের মালিক?’ কানোরিয়ার দিকে তাকিয়ে সুবিমল।

‘হ্যাঁ, রাজীবের কাছে মারা যাওয়ার ঘটনাটা শুনেছি। স্যাড কেস।’

‘ওখানে কখনো থেকেছেন?’

‘না। আর সবার মতো আমিও ওটা কিনেছি বিজনেসের জন্য। দুটো কারণে বলতে পারেন। প্রাইস বুমে, দাম আকাশ ছোঁয়া। তা ছাড়া ভাড়াতে মাসিক ইনকাম। বরাবরই ভাড়া দেওয়া।’

‘এখন ভাড়াটে কে?’

‘এক সেকেন্ড। ডিটেল দিচ্ছি।’ ইন্টারকমে সেক্রেটারিকে ডাকল, ‘প্রেটোরিয়া স্ট্রিটের ফাইলটা নিয়ে এস’ সুবিমলের দিক থেকে চোখ নড়ছে না, ‘কী বলব, চা না কফি?’

‘চিনি দুধ ছাড়া ব্ল্যাক কফি।’

ইন্টারকমেই বলল, ‘বিজয়কে ব্ল্যাক কফি বলো, দুধ চিনি ছাড়া।’ সুবিমলের দিকে তাকিয়ে, ‘ওয়েল ফার্নিশড ফ্ল্যাট। টেন্যান্টের প্রাইভেসিতে কেউ নাক গলায় না। ভালোই ভাড়া পাওয়া যায়।’

কানোরিয়া পুরো প্রফেশনাল। প্রপার্টি বিজনেসে ব্যালান্স শিটই ম্যাটার করে। টেনান্টকে নিয়ে কে ভাবে।

কফি আর ফাইল এল। ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, ‘এই যে, দিল্লির মি. দেবাংশ ভার্মাকে দেওয়া। ওর ডিটেলস...’ ফাইলটা ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের দিকে এগিয়ে দিল।

সুবিমল কন্ট্র্যাক্ট পেপারের সঙ্গে দেবাংশের ডিটেলসেও চোখ বোলাল। ঠিকানা, ইমেল, ফোন নাম্বার সবই আছে। ডায়রিতে টুকে নিল। গত ছ মাস ফ্ল্যাটটা ভাড়ায়।

‘ভাড়া দেয় কীভাবে?’ দেখতে দেখতেই ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করল।

‘এক বছরের ভাড়া ক্যাশে দেওয়া। অ্যাডভান্সের সঙ্গেই।’

সুবিমল সিঁটিয়ে গেল। কানোরিয়াকে তো জেনুইনই মনে হচ্ছে। কিন্তু এই দেবাংশ ভার্মা, যে ক্যাশে এক বছরের টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছে তাকে সুবিধার ঠেকছে না। দিল্লি থেকে কলকাতায় এক বছরের ফ্ল্যাট ভাড়া কেন? তাও ক্যাশ অ্যাডভান্স।

দিল্লিতে দেবাংশ ভার্মাকে ফোন করায় জবাব এল ‘নম্বরটির কোনও অস্তিত্ব নেই।’ ব্যাপারটা গণ্ডগোলে। দিল্লি পুলিশও জানাল, ঠিকানাটা ভুয়ো। ওই ঠিকানায় ওরকম কেউ থাকে না। তাদের নেটওয়ার্কে তন্নতন্ন করে খুঁজেও দেবাংশের হদিশ মিলল না।

সুবিমল কানোরিয়াকে ফোন করল, ‘টাকাটা কে দিয়েছিল?’

‘মনে নেই। হয়ত দালাল হবে। নিশ্চয়ই কাউকে অথরাইজ করেছিল।’

সে তো বটেই। ফ্ল্যাটটা যে বেয়াইনি কাজের জন্যেই বেনামে নেওয়া হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যার ফল এই বেমক্কা ঘাড়ে এসে পড়া মেয়েটার খুন। দিল্লিতে বসে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নেওয়ার মোটিভটা যাচিয়ে নিতে হচ্ছে। তার লিড এই মেয়েটার পরিচয়। তার জন্যে ওকে তদন্ত করতে হবে। হ্যান্ডব্যাগে

তেমন কিছু নেই। কেন যে সরকার সকলের সঙ্গে আধার কার্ডের কপি রাখাটা বাধ্যতামূলক করে না। এখন ওর ফোনটাকে নিয়ে পড়তে হবে। ক্র্যাক করলেই সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

ফরেন্সিক এক্সপার্ট অফিসে রিপোর্ট দিল 'দড়ির ফাঁসে দম আটকে খুন। অ্যাস্ফিক্সিয়ায় মৃত্যু। মেয়েটার নিজের ছাড়া অন্য কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট মেলেনি।'

'কেউ ওকে খুন করেছে। দড়ির ফাঁসেও কোনও ছাপ নেই?'

'না স্যার। সুইসাইড নয়। নিঃসন্দেহে হোমিসাইড।'

'গ্লাস, ভুজিয়া, হুইস্কির বটল কোথাও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই?'

'না স্যার। এমনকি দেওয়ালেও নয়।'

'স্ট্রেঞ্জ। কেউ ডেফিনিটলি সঙ্গে ছিল, যদিও কোনও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেই। অদ্ভুত! ডোর নবেও আঙুলের ছাপ নেই?'

'না। ফরেন্সিক্যালি এর সঙ্গে জড়িত কারও হদিশ নেই।'

'তবু কনফার্মড এটা হোমিসাইড?'

'নিঃসন্দেহে। পোস্ট মর্টেমে তাই রিপোর্ট দিয়েছি।' পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা এগিয়ে দিল।

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট মাস্ক করলে?'

'যদি হিলেক্স স্প্রে, যাতে ০.৩৬ শতাংশ বেঞ্জোকাইন অ্যারোসল ফর্মে থাকে, সেটা হাতে ব্যবহার করে থাকলে হতে পারে। তাতে হাতে একটা প্লাস্টিকের আস্তর পড়ে যায়। তখন আঙুলের ছাপ আর পাওয়া যায় না।'

'অদৃশ্য খুনী খুব বুদ্ধিমান কেউ' সুবিমল বিড়বিড় করল।

নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন তদন্ত। রিপোর্ট মিলিয়েও হাতে কিচ্ছু নেই। একমাত্র এই মৃত মেয়েটাই একমাত্র আলো। নির্ঘুম কেটে যাচ্ছিল রাতগুলো। এই অন্ধকার কুয়াশায় কীভাবে ওর পরিচয় পাবে?

মোবাইল থেকে কোনও রাস্তা মিলতেও পারে। পুলিসের টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞর পেছনে পড়ে গেল। কলার আইডি নিয়ে সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে কথা বলা। জানা গেল এটা মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা রেণুকা ব্যানার্জির। মহিলার ঠিকানাপত্র জোগাড় হল।

ফোনে তাকে, 'মিসেস রেনুকা ব্যানার্জি বলছেন?'

'বলছি' এক মধ্যবয়স্কার গলা।

'সুবিমল ব্যানার্জি। ওসি, থিয়েটার রোড। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'কেন? কী হয়েছে?' মহিলা স্বর কেঁপে উঠল।

'দেখা হলেই বলব।'

'আমার ঠিকানা জানেন?'

'হ্যাঁ। এক ঘন্টার মধ্যে আসছি।' ফোন রেখে উঠে দাঁড়াল সুবিমল।

***

পুলিস কবে তদন্ত শুরু করবে তার জন্যে দীপাঞ্জনা দু-হপ্তা বসে থাকতে পারল না। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। ভাইকে যথেষ্টই ভালোবাসে। বাবা-মা অনেক আশা নিয়ে আছে। ব্রিলিয়ান্ট, বুদ্ধিমান, যথেষ্ট কর্মোদ্যমী ছেলে। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ইকনমিক্স নিয়ে পাশ করে দিল্লিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করবে ঠিক করল। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে চান্সও পেয়ে গেল।

ভবানীপুর থানায় ফিরে গেল, 'স্যার, এখনো ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তারা কিচ্ছু বলতে পারছে না। কোনও ক্লু নেই হতে পারে?' ফোঁপাচ্ছে।

'কবে থেকে নিখোঁজ?' ওসি অনিমেষ দাশ জানতে চাইল।

'চারদিন হয়ে গেছে ট্রেস নেই'

'ওঁর সম্পর্কে আরও কিছু...'

'আমার থেকে তিন বছরের বড়। দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে মাস্টার্স। ফিরে ডক্টোরাল ফেলোশিপের জন্যে ইউকে, অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটিগুলোয় অ্যাপ্লাই করছিল। খুবই অ্যাম্বিশাস।'

'ডাক পায়নি?'

'ঠিক বলতে পারব না। হি ওয়াজ ট্রাইং হিজ লেভেল বেস্ট। আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের। টাকাটাই প্রাইম। ওসব দেশে যা খরচ বাবা-মা অতটা পেরে উঠবে না।'

'বাড়িতে আর কে কে আছে?'

'বাবা সেন্ট্রাল গাভমেন্ট এমপ্লয়ী। মা সরকারি স্কুলে হেডমিস্ট্রেস। আর আমরা দুজন।'

'কোথায় পড়ছ?'

'প্রেসিডেন্সিতে। থার্ড ইয়ার ইংলিশ।'

'গার্লফ্রেন্ড?'

'ঠিক জানি না। ওর ফোকাসটাই কেরিয়ারে। দিল্লিতে কেউ ছিল কি না ঠিক বলতে পারব না। পার্সোনাল ম্যাটার নিয়ে কখনও কথা হয়নি। মাথা ঘামাই না। যথেষ্ট হ্যান্ডসাম, থাকতেও পারে। স্টেডি কেউ থাকলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। এই কদিনে রাতের ঘুম চলে গেছে।'

'শেষ কবে দেখা হয়েছে?'

'চারদিন আগে। সে দিনেই তো এখানে এসেছিলাম। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ও বেরিয়ে যায়।'

'কোথায় যাচ্ছে বলে যায়নি?'

'বলেছিল হোটেল হ্যামিলটনে। কে এক মহিলা দিল্লিতে ওকে খুব হেল্প করেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে। মহিলাকে দেখিনি।'

'নাম?'

'জানি না। বলল, মহিলা এখানে এসেছে। দেখা করতে হবে। কীসব দরকার আছে।'

অনিমেষ লিড পেয়ে গেল। মুহূর্তে মাথায় খেলে গেল এই মেয়েটাকে মর্গে নিয়ে গেলে কেমন হয়? যদিও ওর করুণ মুখ দেখে ইতস্তত করল। না, থাক। বেচারি ভেঙে পড়বে। তার থেকে যে মহিলার সঙ্গে দেখা করতে হ্যামিলটনে গেছিল তারই খোঁজ নিতে হবে।

'চিন্তা করো না। আমরা তো আছি। পরশু একবার এস। দেখি নতুন কোনও খবর পাওয়া যায় কি না। আমাদেরকেও একটু কাজ করার সময় দাও। তোমার মতো আমারও একটা মেয়ে আছে। আমাদের ওপর বিশ্বাস রাখ। কথা দিচ্ছি ওকে খুঁজে বার করব।'

প্রতিশ্রুতি শুনে অবিশ্বাসের ছায়া মুখে মেয়েটি ভবানীপুর থানা থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফেরার রাস্তায় ওসি ভদ্রলোকের কথাগুলো ভেবে হাসি পাচ্ছিল। সত্যিই কি তদন্ত করবে, না ফাঁকা সান্ত্বনা মাত্র। সবাই জানে যুৎসই ক্যাচ না থাকলে এরা পাত্তাই দেয় না। এদের ফিলিংস বলে কিছু নেই। যদিও এই মানুষটাকে অন্যরকম লাগছে। করতেও পারে।

সব্বাইকে এক দিক থেকে বিচার করা বোকামি।

***

সন্ধে হয়ে আসছে। আর-সব দিনের মতোই কাশীর গঙ্গার দশাশ্বমেধ ঘাটে বিশ্বনাথের মন্দিরের কাছেই ঘাটের রানায় বিকেলের সন্ধ্যারতির প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। অদূরে নৌকোয় মানুষজন আরতি দেখবার জন্যে প্রত্যেক দিনের মতোই ভিড় জমাচ্ছে। আরতির জন্যে পণ্ডিতরা তৈরি হচ্ছে। আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। যেখানে আরতি হবে, ঘাট আর গঙ্গার মধ্যেখানের খিলানগুলোও আলোয় উজ্জ্বল। 'গঙ্গা সেবা নিধি' লেখা গ্লো সাইনটাও আলোয় ঝকঝক করছে। ফুল আর ধূপের গন্ধে বাতাসে পবিত্রতার আমেজ। 'ওং জয় গঙ্গে মাতা...' কোনও মহিলা মিঠে সুরে স্তোত্রপাঠ করছে। চারদিকে শান্তি, নির্মলটা, পবিত্রতার বাতাবরণ।

আরতি শুরু হতেই আচমকা হইচই। অল্প দাড়িওয়ালা, সাদা কটনের শার্ট, খাকি ট্রাউজার পরা এক বিদেশি দর্শনার্থী অজ্ঞান হয়ে গেছে। কয়েকজন কমবয়েসি পণ্ডিত দেখতে ছুটে এল। তারাই ওকে টেনেটুনে একটু দূরে ফাঁকা একটা কোণে নিয়ে গেল। মন্দিরের ডাক্তার এসে পড়ল। লোকটির চক্ষু স্থির।

'মারা গেছে। ম্যাসিভ মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।' ডাক্তার জানাল।

'গঙ্গা সেবা নিধি'-র জন্য কয়েক ভলান্টিয়ার, সাহেব যেখানে বসেছিল সেখানে তার মালপত্র জড়ো করতে ছুটে গেল। কেউ নেই সেখানে। পুলিস এসে গেছে। মৃতের পকেট সার্চ করে পরিচয় জানার চেষ্টায়। পাওয়া গেল মৃতের সই করা ছবি আর ঠিকানা সহ মার্কিন আইডেনটিটি কার্ড। জ্যাক হ্যামিলটন। অ্যামেরিকার বাসিন্দা। সব ভক্তের মতোই সে-ও কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনেই এসেছিল। সঙ্গে কয়েকটা ১০০ মার্কিন ডলারের নোট, ড্রাইভিং লাইসেন্স। যেখান থেকে তার ঠিকানা ভেরিফাই করাও সম্ভব। তাড়াতাড়ি বডি কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, ডাক্তারেরা মৃত বলে ঘোষণা করল। পরিবারকে জানাতে হবে। খুব ভাগ্য ওর আইডেন্টিটি জানা গেছে। মার্কিন দূতাবাস ওর ঠিকানা, ফোন নম্বরের সততা কনফার্ম করল।

সেই নম্বরে ফোন করতেই শুষ্ক, বলবান নারীকণ্ঠ ভেসে এল, 'হ্যালো।'

'ইন্ডিয়ান পুলিস থেকে অবিনাশ রাঠোর। জ্যাক হ্যামিলটনকে চেনেন?'

'আমার হাসব্যান্ড।'

'ম্যাম, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি উনি আর জীবিত নেই। কাল বিকেলে বেনারসে গঙ্গার ধারে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন।'

'কী?!' কয়েক মুহূর্ত চুপ। অবিনাশ তাকে সামলে নেওয়ার সময় দিল। অপর প্রান্তে মহিলার ফোঁপানির শব্দ। একটু সামলে নিয়ে বলল, 'বেনারস কেন? ও তো সিকিমে কয়েকটা মনাস্টেরিতে গেছে জানতাম।'

'বলতে পারছি না ম্যাম। উনি কি এখানে তীর্থ করতেই এসেছিলেন?'

'ঠিক তা নয়। কিছু কাজও ছিল।'

'তাহলে মনাস্টেরি কেন?'

'বলেছিল ওখানকার মঙ্কদের সঙ্গে দরকার আছে।'

'কোন মনাস্টেরি, কিছু বলেছিল?'

'না। কিন্তু হঠাত বেনারসে কেন?' মহিলা থই পাচ্ছে না।

'তা তো জানি না। আপনি যদি কিছু বলতে পারেন। ওর বডি নিতে আসছেন তো?'

'সিওর। নেক্সট ফ্লাইট যেটা পাব, তাতেই। বডি কোথায়?'

'বেনারস পুলিস মর্গে। হাসপাতাল থেকে সার্টিফিকেট দিয়েছে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। কোনও নির্দিষ্ট মেডিক্যাল হিস্ট্রি না থাকলে এরকম আচমকা মৃত্যুর ক্ষেত্রে অটপ্সি করা নিয়ম। তার জন্যে আপনার লিখিত কনসেন্ট লাগবে। আমার ডিটেলসটা সেভ করে রাখুন। এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে কোনও সমস্যা হবে না। যে কোনও দরকারে ফোন করতে পারেন।'

জ্যাক হ্যামিলটনের যদি কোনও সিকিমের মনাস্টেরিতে মঙ্কের সঙ্গে কাজ, হোয়াই বেনারস? হয় মিথ্যে বলেছে, নয়ত অন্য কোনও কারণ। সেই মিসিং লিঙ্কটার তদন্ত করতে হবে। স্পিরিচুয়াল কারণ ছাড়া একজন অ্যামেরিকানের সঙ্গে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কী কাজ থাকতে পারে? অবশ্য যদি না ওই মনাস্টেরির সঙ্গে কোনও এনজিও স্পনসরশিপের ব্যাপার থাকে।

তার জন্যে বিরাট এক চমক অপেক্ষা করছিল।

***

মহিলা এসে পৌঁছনোর পর তার সম্মতি নিয়ে অটপ্সি করতেই সত্যিটা সামনে। প্রাথমিক ডায়গনোসিস ভুল ছিল। মোটেই মায়োকর্ডিয়াল ইনফার্কশন নয়। আট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোডাল ব্লকের জন্য সিভিয়ার

ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের কারণেই মৃত্যু। মৃতের পেটে খাওয়ার কিয়দংশ। সাধারণ টক্সিকোলজিক অ্যানালিসিসে কিছু মেলেনি। পরে ডিটেল স্টাডিতেই রক্তে ডিজিটক্সিন মিলল।

অবিনাশ মহিলাকে জিগ্যেস করল, 'কার্ডিয়াক পেশেন্ট ছিল? ডিজিটালিস নিত?'

'যদ্দুর জানি, না।' সঙ্গে সঙ্গে জবাব।

'স্ট্রেঞ্জ! অটপ্সিতে ডিজিটালিসের ওভারডোজ।'

কনফারেন্স রুমে ফরেন্সিক এক্সপার্টও ছিল। এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবার মুখ খুললেন, 'ডিজিটালিস যদি না নিয়ে থাকে, ধুতরোর বিষও হতে পারে। ওই গাছের সব অংশই মারাত্মক টক্সিক। খেলে ডিজিটালিসের এফেক্ট মনে হবে।'

জ্যাক হ্যামিলটনের স্ত্রী এসব ডাক্তারি, আইনি কচকচি বোঝে না। অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল, 'ধুতরো কী?'

'এক ধরনের গুল্ম। তাতে ফুল, ফল দুই-ই হয়। খুবই বিষাক্ত। অটপ্সিতে মৃতের পাকস্থলীতে কিছু গুঁড়ো মতো পাওয়া গেছে। যদ্দুর সম্ভব চা বা ড্রিঙ্কসের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাই দেখে হার্ট অ্যাটাক মনে হয়েছিল। যদিও ৪৮ ঘন্টা বাদে কিছু প্রমাণ করা সত্যিই কঠিন, আমার মনে হয় ধুতরো থেকেই। এটা স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে না। খুন!!'

'ওঃ গড, মার্ডার!!!' মধ্যবয়সী মহিলাটি রীতিমতো হকচকিয়ে গেল, 'কে ওকে খুন করবে। কেনই বা?'

'বলা কঠিন। ডিটেলে তদন্ত করতে হবে।' অবিনাশ বিহ্বল শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ম্যা'ম, আপনাকে বডি নিয়ে যেতে সব রকম সাহায্যই করব। তদন্তের জন্যে ওর ব্যাকগ্রাউন্ড জানাটা জরুরি। আপনার অসুবিধে নেই তো?'

'একেবারেই নয়। আমিও জানতে চাই কীভাবে হল।' মহিলা বলেন।

'কিছু পার্সোনাল প্রশ্ন করতে পারি?'

'নিশ্চয়।' হাস্কি গলায় উত্তর।

'ওর পেশা?'

'অ্যামেরিকায় একটা এজেন্সি। যেহেতু প্রচুর যোগাযোগ ছিল, অনেকেই ওকে বিভিন্ন কাজে হায়ার করত। কাজ হলে, ভালো কমিশন। কী ধরনের কাজ ঠিক বলতে পারব না।'

'ভারতে কেন এসেছিলেন?'

'আসার আগে বলছিল কী সব নাকি বিজনেস ডিল আছে। তাছাড়া প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতাও পছন্দ করত। বৌদ্ধধর্মের বিশাল প্রভাব ওর জীবনে। এখানে আসার সময়েই ঠিক করেছিল তিব্বত থেকে শুরু করে নর্থ-ইস্টের বিভিন্ন মনাস্টেরিতে ঘুরে মঙ্কদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। এই বেনারসে কেন যে বিকেলের আরতির সময়ে, কে জানে?'

'শেষ কবে কথা হয়েছিল ?'

'দিন কয়েক আগে। বলল নিরাপদে দিল্লি পৌঁছেছে। যেহেতু সিকিম যেতে হবে, সব সময় যোগাযোগ না-ও হতে পারে। অনেক রিমোট এলাকায় মোবাইলের টাওয়ারই পাওয়া যায় না।'

'এমনিতে আপনাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কীরকম?'

'অ্যামেরিকার দিক থেকে দেখলে খুব মন্দ নয়।' হাসল, 'বলতে পারেন আপার-মিডলক্লাস। ইন্ডিয়ার তুলনায় আপনারাই ভালো বলতে পারবেন।'

অবিনাশের আর কোনও প্রশ্ন ছিল না। তার টিম বডি নিয়ে মহিলাকে ওদের ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাঞ্চে পৌঁছবার ব্যবস্থা করে দিল। যেখানে স্বামী মারা গেছে, পরদিন সকালে মিসেস হ্যামিলটন দশাশ্বমেধ ঘাটে। বিবশ হৃদয়ে অশ্রুসজল চোখে গঙ্গার দিকে চেয়ে। কাঁদতেই চাইছিল। যেখানে তার স্বামী শেষ নিঃশ্বাস

ফেলেছে সেখানে দুফোঁটা চোখের জল ফেললেও শান্তি। যদিও জানত না হিন্দুধর্মে কাশীতে মৃত্যু হওয়াটা খুবই পবিত্র।

বছর পনের বয়েসের একটি ছেলে কিছু দূর থেকে দেখছিল। সে এগিয়ে আসে, 'আপনি কী এখানে কদিন আগে যে বিদেশি মারা গেছে তার স্ত্রী?'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আপনার মতো বিদেশি এত ভোরে এসে তো কাঁদে না। তাই ভাবলাম...' ছেলেটা পাশে বসে ফিসফিস করে বলল, 'ম্যাডাম, কাউকে বলবেন না যদি কথা দেন একটা কথা বলি।'

'দিলাম।' ওকে দেখছে।

'সেদিন আরতির আগে আপনার স্বামীর সঙ্গে একজন সাধুর ঝগড়া হয়েছিল। আমি দেখেছি।'

'ঝগড়া! কেন, তুমি জানো?'

'তা তো জানি না। একটু দূরে ছিলাম। তখন তো চারদিকে খুব আওয়াজ হয়।'

'অনেকক্ষণ ঝগড়া হয়েছিল?'

'প্রায় দশ মিনিট।'

উঠে দাঁড়াল ও, 'যাই। আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই পুলিস পেছনে পড়ে যাবে।'

অবিনাশ বিশাল চিন্তায়। দশাশ্বমেধ ঘাটের ঘটনা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। রীতিমত অনেক প্ল্যান করে, আটঘাট বেঁধে খুন। মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র জ্যাক হ্যামিলটন বাদে কোনও ক্লুই নেই।

তাহলে?

বুঝতে পারছিল তদন্ত করতে হলে জ্যাক যখন দিল্লিতে এসে নামল তখন থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু এই বেনারসে কেন?

***

বছর কয়েক আগে।

অ্যালবার্ট চৌধুরী তার মেয়ে এলেনার মানসিক নিশ্চিন্তির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই বড্ড একা হয়ে পড়েছে। তার অনুপস্থিতিতে এমন কাউকে খুঁজছিল যে তার অভাবটা খানিকটা পূরণ করতে পারবে। এমন একটা জায়গা চাই যেখানে ও স্বস্তিতে থাকবে।

বার কয়েক পাঞ্চেত জোংপার কাছে গেল। কয়েকবার মেয়েকে নিয়েই। বুঝতে পারল এই মনাস্টেরিতে ও ভালো থাকে। শেষমেশ স্থির করল শান্তিতে বেড়ে ওঠার জন্যে এ জায়গাটাই ওর পক্ষে উপযুক্ত। পাঞ্চেতের তত্ত্বাবধানেই ভালো থাকবে।

একদিন, এলেনা তখন স্কুলে, পাঞ্চেতের সঙ্গে কথা বলছিল।

'সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। জীবন দেখেছি। এলেনা যে অদ্ভুত, অন্যদের থেকে আলাদা, আমার থেকে ভালো কেউ জানে না। ওর মায়ের মৃত্যুর পর আরও একা হয়ে গেছে। খুব কমই কথা বলে। অন্যের সঙ্গেও মেশে কম। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও দেখেছি কেমন ছাড়া ছাড়া। যেন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। সেই জন্যেই এরকম শান্ত জায়গার কনভেন্টে দিলাম, যাতে ঠিক মতো স্কুলিংটা হয়। ওখানে কেবল প্রথাগত শিক্ষাই হচ্ছে। তার বাইরেই তো আসল শিক্ষা। আপনিই ওকে সেই মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে পারবেন। ওকে সাহায্য করলে ও স্বাভাবিকভাবে বড় হতে পারবে।'

'আমি!' পাঞ্চেত অবাক।

'হ্যাঁ। এত ভালো আর কোথাও থাকে না'

'জানি না আমি কদ্দুর করতে পারব। যখন বলছেন নিশ্চয়ই চেষ্টা করব' লাজুক মেয়েটির প্রতি তারও যথেষ্ট মমতা।

অ্যালবার্ট বলল, ‘প্রকৃতির মধ্যেখানে, আপনার যত্নে বড় হয়ে উঠতে পারলে সেটাই ওর সবথেকে বড় পাওয়া।’

‘আমায় কেন?’ পাঞ্চেত জানতে চাইল।

‘যে শিক্ষা আপনি দিতে পারবেন সমাজ দিতে পারবে না।’

পাঞ্চেত অবাক। মাথা কাজ করছে না। একজন অশিক্ষিত অন্ধ ভিক্ষু কী এমন শিক্ষা দিতে পারে যা সভ্য সমাজ পারে না?

‘জানি না। অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা করব।’

একজন পূর্ণবয়স্ককে কিছু শেখানোর চেয়ে কোনও বাচ্চাকে শেখানো অনেক সহজ। উত্তরসূরি এলেনাই তার স্বপ্ন সফল করতে পারবে।

‘ওকে একবার এখানে নিয়ে আসবেন।’

‘নিশ্চয়ই।’

পরের দিনই অ্যালবার্ট এলেনাকে নিয়ে এল। পাঞ্চেত ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ‘মি. চৌধুরী, আমার যেটুকু ক্ষমতা, ওর স্বপ্ন পূরণ করতে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব।’ বলতে বলতে এলেনাকে কাছে টেনে নিল, ‘রোদ্দুর দেখতে চাও?’

‘হ্যাঁ।’

‘আমার সঙ্গে এসো। যখনই একা লাগবে আমার কাছে চলে এসো। চাঁদ, সূর্য, তারা, গাছের নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখাব। কাঞ্ছাকে বললেই নিয়ে আসবে।’

এলেনা বুঝতে পাচ্ছে, স্কুলে যে শান্তির সন্ধানে এখানেই তা মিলবে। মাকে হারাবার পর এই শান্তিটকুই কাম্য। একে দেখে মনে হচ্ছে এইখানেই সেই শান্তির সন্ধান।

প্রকৃতির বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে সেই শান্তিরই সন্ধানে।

***

মহিলা ওর অপেক্ষায় ছিল। মধ্যমগ্রামের সুকান্তনগরের একটা বাই লেনে রেণুকা চ্যাটার্জির একতলা ছোট বাড়ি। সুবিমলকে দেখে মাঝবয়েসী মহিলাটি কৌতূহলীভাবে চেয়ারটা এগিয়ে দিল।

খারাপ খবরটা দেওয়ার আগে সুবিমল একটু সময় নিল, ‘এক গ্লাস জল। ’

‘নিশ্চয়ই।’ মহিলা পাশের ঘরে উধাও।

ঈগলের চোখে সুবিমল ঘরটা দেখছে। বড় একটা বিছানা আর চেয়ার। বড় দুটো বিমে ছাদ। দেয়ালে মহিলা আর তার স্বামীর কম বয়েসের একটা সাদা কালো ছবি। প্রেটোরিয়া স্ট্রিটের মেয়েটির সঙ্গে মহিলার সম্পর্কটা আন্দাজ করার চেষ্টা করল। কীভাবে খবরটা দেওয়া যায়।

‘কয়েকদিন আগে এই ফোনে আপনি রিং করেছিলেন?’ মৃত মেয়েটির ফোনটা বার করল।

‘হ্যাঁ। আমার মেয়ের ফোন। কোথায় পেলেন?’

ওর স্বামী ঘরে ঢুকল, ‘কী ব্যাপার?’

‘এই ভদ্রলোক রিয়ার ফোনটা পেয়েছে।’

সুবিমল একটু থিতু, ‘রিয়া বললেন?’

‘হ্যাঁ, রিয়ারই ফোন। এই তো দিন কয়েক আগে ওকে ফোন করলাম। ব্যস্ত আছে বলে সুইচ অফ করে দিল। পরে বার কয়েক চেষ্টা করেছি। বারবারই সুইচ অফ। ওর বন্ধুদেরও করেছি। খবর পাইনি।’ স্বামী বলল, ‘শেষে লোকাল থানায় মিসিং ডায়রিও করে এলাম।’

‘ওরা হদিশ দিতে পেরেছে?’

‘না।’

সুবিমল বুঝল সত্যিটা আর চেপে রাখা যাবে না, 'ও আর বেঁচে নেই। প্রেটোরিয়া স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে ওর ডেডবডি পাওয়া গেছে।'

স্বামীর কোলে রেণুকা কান্নায় ভেঙে পড়ল। নিঃশব্দে স্ত্রীকে সামলাবার চেষ্টা করছিল স্বামী। জন্ম থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত মেয়েটার একের পর এক ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

'জানতাম এরকমই কিছু একটা হবে। যে জীবন মেয়েটা কাটাত তাতে এরকম কিছুই স্বাভাবিক।' ভদ্রলোক আচমকা ফেটে পড়ল।

'কীরকম জীবন?'

'জানি না আপনি কে, কেন এসব কথা...'

'আমি সুবিমল ব্যানার্জি, ওসি থিয়েটার রোড পি এস।', সুবিমল নিজের পরিচয় দিল।

সম্ভবত অচেনা কারও কাছে পরিবারের গোপন কথা ভাঙবে কি না ভাবছিল। মেয়েটা আর কখনো ফিরে আসবে না। লুকিয়েই বা কী লাভ? একটা বালিশ টেনে স্ত্রীকে শুইয়ে দিল। যতই হোক, ওর তো মা। ধাক্কাটা সামলাতে একটু সময় দিতেই হবে। নিজেকে একটু সামলে বলতে শুরু করল, 'আমরা দুজনেই স্কুল মাস্টার। আমি রিটায়ার করেছি। ওর আর এক বছর বাকি। বড়লোক নই। আমাদের সিম্পল লাইফস্টাইলের সঙ্গে মেয়েটা মানাতে পারত না। ওর অনেক বড় স্বপ্ন। পড়াশোনা করতে চাইত না। এইচএসের পর একটা পার্ট টাইম অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। সঙ্গে আরও বাড়তি আয়, বুঝতেই পারছেন।'

'আপনারা কিছু বলেননি?'

'এ যুগের ছেলেমেয়েদের তো চেনেন। এরা কারও পরামর্শের তোয়াক্কা করে না, পাত্তাও দেয় না। পশ্চিমী কায়দার সমস্ত খারাপ দিক ওদের মাথা খেয়ে ফেলেছে। জানে কেবল 'স্বাধীনতা', তা-ও তার একপেশে অর্থে। ওদের জীবনকে দেখার চোখ আমাদের থেকে অনেক আলাদা। নিজেদের দেখা টুকুকেই কেবল বোঝে।'

'রোজ বাড়ি ফিরত?'

'সব সময় নয়। কত বার বলেছি। ওর মা কত চেঁচিয়েছে। যতই হোক মায়ের স্নেহ। অস্বীকার করতে তো পারে না।' ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'বাড়িতে টাকা দিয়ে যেন মাথা কিনে নিয়েছিল। সামান্য রোজগারে তো ভালো করে সবসময় চালাতে পারি না'

রেণুকা বিছানা থেকেই কান্নাভেজা গলায় বলল, 'কী করতে পারি? ঘরে তালা বন্ধ করে রাখব সোমত্ত মেয়েকে? না, বাড়ি থেকে লাথি মেরে বার করে দেব?'

'ফল কী হল নিজেই দেখ এবার' স্বামী ঝাঁজিয়ে উঠল।

সুবিমল নির্বিকার শান্তমুখে শুনছে। এবার পয়েন্টে এল, 'কাদের সঙ্গে ঘুরত জানেন কিছু? বয়ফ্রেন্ড কাউকে চেনেন?'

'বয়ফ্রেন্ড! ওসব ভুলে যান। ওদের ছেড়া ময়লা কাপড়ের মতো দেখে। ব্যবহার করো, ফেলে দাও। ওর জীবন সম্বন্ধে আমার সামান্যতম আগ্রহ ছিলও না। নেইও।'

'পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে ওকে গলা টিপে মারা হয়েছে। কিন্তু ফ্ল্যাটে কারও টিকিটি পাওয়া যায়নি। যদি কিছু সাহায্য পেতাম, তাহলে মার্ডারারকে ধরতে পারতাম। আপনারাও নিশ্চয় ওর শাস্তি চান?'

'পারলে সাহায্য করব। নিশ্চয় চাই ওর খুনি শাস্তি পাক। কিন্তু কীভাবে? ওর বডি এখন কোথায়?'

'পুলিস মর্গে। আপনারা শনাক্ত করলেই বডি দিয়ে দেব।'

'একটু সময় দিন। তৈরি হয়ে আপনার গাড়িতেই চলে যাব। ছোট মেয়ে দিয়াকে ডাকি। সবাই-ই যাব।'

পুলিসের জিপে চারজনেই মর্গের দিকে যাত্রা করল। এখনো অন্ধকারে কোনও আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে না।

হতে পারে রিয়া নামে এই মেয়েটা আপস্টার্ট জীবন কাটাত। কিন্তু খামোকা কেউ তো গলা টিপে মেরে রেখে যাবে না। নিশ্চয় পেছনে অন্য কোনও রহস্য আছে।

***

ক্যামাক স্ট্রিটে হ্যামিলটন হোটেলে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর অনিমেষ দাস জানতে পারল দ্বৈপায়ন কারুর সঙ্গে দেখা করতে বিকেল ৫টায় হোটেলে আসে। টি স্টলের লোক ও আশেপাশের অন্যান্যদের থেকে এও জানা গেল হোটেল ছাড়ে ছটা নাগাদ।

রিসেপশনের স্মার্ট মেয়েটি হাসল, 'এক মিনিট স্যার। ভিজিটরস বুকটা চেক করে বলি।'

ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কাজ সেরে ওটা নিয়ে ফিরল, 'কী বার বললেন, ক'টার সময়?'

'দ্বৈপায়ন নাগ, ৫টা নাগাদ।'

'হ্যাঁ, দ্বৈপায়ন নাগ এসেছিল ২০৬-এর এক মহিলার সঙ্গে দেখা করতে। ৫টা ১০-এ।'

'মহিলার নাম?'

'এলেনা চৌধুরী। সকালে উনি চেক ইন করেন।'

'ওর ঠিকানা আর ফোন নম্বরটা...'

'এখানে দিল্লির কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আছে।' মেয়েটি ভিজিটারস বুকটা এগিয়ে দিল।

'দ্বৈপায়ন কখন গেল?'

'আমরা কেবল এন্ট্রিটারই নোট রাখি, ডিপার্চার নয়।'

'এলেনা চৌধুরী চেক আউট করেন?'

'পরদিন সকাল ১০টায়।'

'কোথায়, তার কোনও রেকর্ড?'

'না।'

বিচিত্র! মাত্র একদিনের জন্যেই এলেনা এসেছিল। দ্বৈপায়ন বা অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতেই?

'আর কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

মেয়েটি ফের ভিজিটারস বুকে ডুবে যায়, 'না।'

একেই ইনভেস্টগেট করে দেখা যাক। কফিটা শেষ করে বিদায় নিল।

অনিমেষ এলেনাকে ফোন করল। পরিচয়ের পরে জানতে চাইল, 'দ্বৈপায়নের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ও আমার ভাইয়ের মতো। দিল্লিতে আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। কেন বলুন তো?'

'হ্যামিলটন হোটেলে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন কখন চলে যায়?'

'৬টার পরে, কোনও এক সময়। একজ্যাক্ট সময়টা বলতে পারব না।'

'ওর বোন দীপাঞ্জনা অভিযোগ করছে, তখন থেকেই ওকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ওর বোনের কথা ওর মুখেই শুনেছি। কখনো দেখা হয়নি। বোধহয় প্রেসিডেন্সিতে পড়ে।'

'হ্যাঁ। বলেছিল ওখান থেকে কোথায় যাবে?'

'না। হয়ত বাড়িতেই'

'থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাম।'

ফোনটা কাটল। এখান থেকেও কোনও লিড পাওয়া গেল না। তাহলে অন্য জায়গা থেকে জানতে হবে কোথায় গেল।

***

‘কাজ খতম। অ্যাকাউন্টে ডলার ক্রেডিট করুন’ জনের ছোট্ট এসএমএসটা আইফোনে আসতেই বোঝা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ইন্টারব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। ডালউইচ ভিলেজ ম্যানসন থেকে ম্যাসেজ ‘টাকা জমা পড়েছে। থ্যাঙ্কস।’ রিপ্লাই পাঠিয়েই মার্ক ডেভিডকে টেক্সট করল, ‘কাজ শেষ। টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেছে।’ মুহূর্তে জবাব ‘সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ’।

ব্রিটিশ অর্থনীতি চুলোয় গেলেও মার্ক হেনলির কিছু যায় আসে না। তার মাথায় অন্য কিছু। নিজের দেশ আর ইইসিকে অর্থনৈতিক টালমাটাল থেকে ধ্বসে পড়তে থাকা মার্কিন অর্থনীতিকে আঁকড়ে বার করতে আগ্রহী। ডেভিড ডালটন যা চায় তা-ই করতে হবে। যা করছে নিজের জন্যে নয়। মাতৃভূমির হারানো সম্মান উদ্ধারই লক্ষ্য।

ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ধ্বসে গেছে। সেই পোড়া ছাই থেকে যেভাবেই হোক পুনর্জীবন লাভ করতে হবে। তার একমাত্র বাজি অ্যামেরিকা। যদি অ্যামেরিকার অর্থনীতির নিয়মিত পতন রোখা যায় অ্যামেরিকার সাহায্যেই ব্রিটেন ফের বিশ্বের ওপর দখল নিশ্চিত করে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। নীল রক্তের তেজে চায় অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ফের উঠে দাঁড়াক। অক্সফোর্ডের প্রাক্তন ব্লু। ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা তো ধরে।

ডেভিড ডালটন টেক্সটটা পেল সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায়। র‍্যাঞ্চ থেকে একটা বিজনেস মিটে যোগ দেওয়ার জন্যে মার্ক এসএলআর ম্যাক্লারেনে পা রাখবার ঠিক মুখে। মার্কের মেসেজে মুখে রহস্যময় হাসি। দীর্ঘদিনের বন্ধু। দুজনেই দুনিয়ার উঁচু মহলের বাসিন্দা। অভিজাত মহলের লোক হিসেবে ভাবনায় মিল আছে।

পাশে চারমাইন লিওন জিজ্ঞেস করল, ‘নিশ্চয় ভালো খবর’

ডেভিড চুপ। মাথায় আসন্ন বিজনেস মিট। তার আগে চারমাইনকে এয়ারপোর্টে নামাতে হবে। তার নতুনতম সঙ্গিনীটি বেভারলি হিলসের হলিউড সুপারস্টার। উইকএন্ডে ফুর্তির জন্য মাঝেমধ্যেই ডেভিডের র‍্যাঞ্চে ঘুরে যায়। বিছানায় ডেভিডের জবাব নেই। কীভাবে কোন মেয়েকে জাগাতে হয় জানে। সেক্সে মজা নিতে জানে, দিতেও।

তাকে চুপ দেখে চারমাইন আর ঘাঁটাল না। সব প্রশ্নের উত্তর হয়ও না, চায়ও না কেউ। ডেভিডের প্রাইভেসিতে ফালতু নাক গলাতে চায় না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। ওর সঙ্গে শুধু দৈহিক সম্ভোগের সম্পর্ক। চায় না অকারণে ওর ব্যক্তিগত জায়গায় নাক গলিয়ে সেই ফুর্তিতে ছেদ পড়ুক।

যত দিন যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্ব জেট স্পিডে উঠে আসছে। এই বিশ্ব পরিস্থিতিতে ডেভিড মোটেই খুশি নয়। একদিন অ্যাংলো-স্যাক্সনরা দুনিয়াকে শাসন করেছে। রাতারাতি তো সব কিছু বদলে যেতে পারে না। কাণ্ডারি ব্রিটেন নয় অ্যামেরিকা। থাকুক। দুজনের শিকড়ই তো এক জায়গায়।

এয়ারপোর্টে চারমাইন হারিয়ে যেতেই ফোন, ‘জ্যাক হ্যামিলটন আছে?’

‘কে বলছেন?’ এক মহিলার হাস্কি কণ্ঠস্বর। চিনতে পেরেছে ‘ডেভিড, কেমন আছো? স্যাড নিউজ, জ্যাক মারা গেছে।’

‘হঠাত? মারা গেল কী করে?’

‘ভারতে গেছিল। বেনারসে হার্ট অ্যাটাক।’ মৃত্যুটা যে খুন, মহিলা চেপে গেল। এখনো খুন প্রমাণ হয়নি। তাছাড়া প্রয়াত স্বামীর বিজনেস ডিল সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

‘শুনে খুব খারাপ লাগছে। কবে ফিউনেরাল?’

‘হয়ে গেছে। ইন্ডিয়া থেকে বডি আনার পর গত সপ্তাহে ফিউনারাল ছিল। আচমকা ধাক্কা। এখনো সামাল দিতে পারিনি।’

‘সাবধানে থেক সুশি। দরকার হলে বোলো, আমি আছি।’

‘সো কাইন্ড অফ ইউ’ ফোন কেটে দিল।

এবার বিজনেস মিটিং।

মার্কটা গন্তব্যে পৌঁছতেই ম্যাকবুক প্রো খুলে মিটিঙের পয়েন্টগুলো ঝালিয়ে নিল। সেনেটর এডোয়ার্ডসকে হাউসে মোশন আনতে কনভিন্স করা দরকার। তার বদলে সামনের ইলেকশনে তার সম্ভাব্য প্রেসিডেন্সির জন্যে যা যা করার করবে। যদি প্ল্যানটা সফল করা যায় তাহলেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গির একটা অফিসিয়াল চেহারা দেওয়া সম্ভব।

***

‘ছবিটা ভালো?’ এলেনা জিগ্যেস করল সুচিত্রাকে।

‘এত সময় কী করে পাও?’

‘ঠিকমতো সময়কে কাজে লাগাতে পারলে ঠিক মিলে যায়। যখন সিকিমে সেন্ট মেরিজে ছিলাম তখন এত সোশ্যাল লাইফ ছিল না। সময় পেলেই ছবি আঁকতাম। নিজের মধ্যে ডুবে যেতে। একঘেয়ে দিনের কাজকর্মের পর বাড়িতে এটাই আমার রল্যাক্সেশন। টিভিতে পলিটিক্সের কচকচিতে রস পাই না। নিজের মতো করে এরকম থাকতেই ভালো লাগে।’

‘এই জন্যেই বিয়ে করোনি?’

‘বলতে পারো। আমায় কে বিয়ে করবে? তোমার মতো আকর্ষণীয় তো নই।’

যে মার্কেটিং ফার্মে এলেনা কাজ করে সুচিত্রা সেখানে সহকর্মী। সেলস ম্যানেজার বলে বেশির ভাগ সময় কোম্পানির খরচে ঘুরে বেড়ায়। থাকে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে একটা ছোট্ট টুরুম ফ্ল্যাটে। সুচিত্রাও একই এলাকারই। ৫ বছরের এক সন্তানকে নিয়ে সংসার। সময় পেলে মাঝেমধ্যে বিকেলের দিকে এলেনার ফ্ল্যাটে ঢুঁ মেরে যায়। সুচিত্রার মাও ওর সঙ্গেই থাকে বলে বাচ্চাকে দেখাশোনার বড় অংশই তার ঘাড়ে। দিনের কাজকর্মের শেষে ফিরেই কর্তা ড্রিঙ্ক নিয়ে টিভির সামনে।

বাকি সহকর্মীদের থেকে বেশি আকর্ষণীয় হলেও ওদের মধ্যে কোনও ইগোর লড়াই নেই। শান্ত এলেনা যথেষ্ট অমায়িক। ওর সঙ্গে কয়েক ঘন্টা সুন্দর সময় কাটানো যায়। এলেনার সৃষ্টিশীল মনের যথেষ্ট গুণগ্রাহী। সমবয়েসী হওয়ায় দুজনে মেলেও ভালো।

‘খুব একটা শিল্প বুঝি না। তোমার ছবি দেখে মনে হয় মানুষের সভ্যতার ব্যপ্তিকেই নানাভাবে ধরতে চাইছ।’ সুচিত্রা বলল।

‘তাই বুঝি? জানি না। যা মনে হয় আঁকি, ব্যাস।’ এলেনা সুচিত্রার ব্যাখ্যায় অবাক।

অফিসের টুকটাক কথার পর সুচিত্রা বেরিয়ে গেল।

রাতে রান্নার মুড নেই। ফ্রিজ খুলে চালিয়ে নেওয়ার মতো কিছু আছে কি না দেখল। দিল্লির গ্রীষ্মকালের গরম। স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে নাইটিটা গলিয়ে এসি চালিয়ে দিল। আলো জ্বালল না। অন্ধকারের মধ্যেই শান্তি।

আবছা মনে পড়ে মাকে। সেই কবে হারিয়েছে। বছর কয়েক আগে বাবাও চলে গেল। বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়লেই ডিপ্রেসড হয়ে পড়ে। জানলার পর্দা সরাতেই অন্ধকারে ঝিকমিক করছে স্তিমিত রাস্তার আলোগুলো। তাকে অন্ধকারে আরও ডুবিয়ে দিচ্ছে। বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভায়োলিনটা হাতে নিল। রাগ বেহাগে ডুবে সুর ছড়াচ্ছে চারদিকে সবকিছু ভুলিয়ে দিতে। একা হয়ে যাওয়ায় খেদ নেই। বাবাই তার সব। কেবল স্নেহময়ই নয়, তার জীবনে ফ্রেন্ড, ফিলজফার আর গাইডও। তার চেয়ে কাছে কাউকে পায়ওনি, চায়ওনি। বাবা-মা দুজনের ভূমিকাই একা পালন করে গেছে আজীবন। আর আছে মেন্টর পাঞ্চেত জোংপা।

শেষবার কলকাতা গিয়েছিল আত্রেয়ী মারা যাওয়ার সময়। হোটেল হ্যামিলটনে। পৌঁছে চট করে স্নান সেরে কানোরিয়াদের ওখানে যায়। বসের হয়ে দিল্লির কিছু প্রপার্টি বেচার দায়িত্ব বর্তেছিল। কথাবার্তা সেরে বিকেলে দ্বৈপায়নকে ডাকে।

বিজনেস ট্রিপ বলে হাতে সময়ও কম। ইচ্ছে পাঞ্চেতের সঙ্গে দেখা করা। অনেকদিন দেখা হয়নি। সকালের ফ্লাইটে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে বাসে মনাস্টেরি।

'কেমন আছো?' পাঞ্চেত জানতে চাইল।

ওর প্রতি অকুণ্ঠ স্নেহ। ছোট থেকে বুদ্ধের শিক্ষায় মানবিকতার পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন জাগতিক সবকিছু মানুষের হিতে উৎসর্গ করতে পেরেছে, অন্য মানুষই বা পারবে না কেন? বস্তুগত প্রাপ্তিই তো শেষ কথা নয়। অন্যের হিতাকাঙ্খাই জীবনকে অর্থদান করে। গত কয়েক শতক সমস্ত ধর্মই এই শিক্ষাই প্রচার করেছে।

'ঠিকই, যেমন থাকি।' পাঞ্চেত বলল 'বাবা চলে যাওয়ার পর একা হয়ে গেছ'

'যখনই ভাবি পাশে আছে, আর একা লাগে না।'

দুঃখ জয় করার উপায় কম নেই। রাগ বেহাগের সুরও অনেক সময় দুঃখের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে মনকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। দুঃখ ভোলানোর সেই সুরই ভায়োলিনের তার দিয়ে মনের তন্ত্রীতে। টের পাচ্ছিল, বাবা পাশে না থাকলেও তার আত্মা ছেড়ে যায়নি। সেটাই শক্তি যোগায়, এগিয়ে দেয় জীবনের পথে।

মাঝেমাঝে যৌবনের দিনগুলো মনে পড়ে। যখনই কিছু হত পাঞ্চেতের কাছে ছুটে যেত। হারিয়ে যেত মনাস্টেরির কাছেই অরণ্যের নৈঃশব্দে।

পাঞ্চেত মাথায় মমতায় হাত বুলিয়ে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সামান্য কথাগুলোতে কী ম্যাজিক! ফের দুনিয়ার মুখোমুখি হওয়ার সাহস পায়।

আজও তা-ই হল। চোখের জল মিলিয়ে গেল। ফিরে পেল নিজেকে।

***

আত্রেয়ীর কেসটা নিয়ে কীভাবে কোন রাস্তায় এগোনো যায় ভেবে পাচ্ছে না। পোস্ট-মর্টেমে বলা হয়েছে মেয়েটির গুরু মস্তিষ্কে একটি বুলেট ফুঁড়ে ভয়ঙ্কর মৃত্যু। বুলেটটাও ভারতে সচরাচর ব্যবহৃত নাইন এমএম ক্যালিবারের নয়। ব্যালিস্টিক টেস্টে পাঠানোর আগে পুলিস ভেবে পাচ্ছিল না মৃতদেহটা নিয়ে কী করবে। হ্যান্ডব্যাগে ওর ছাড়া আরও দুটো ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিলেছে। তার মানে আরও দুজন ওর ব্যাগে হাত দিয়েছে। তারা কারা? ভিড়ের কেউ, না খুনি?

লাজবন্তী বিষয়টা নোট করলেও, গুরুত্ব দেয়নি। মেয়েটার পরিচয় বার করা জরুরি। আন-আইডেন্টিফায়েড বডি বলে চালান করে দেওয়া মানে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া। স্যুটকেস ঘেঁটেও কিছু পাওয়া যায়নি। সালোয়ার-কামিজের মতো মেয়েদের পোশাক সরঞ্জাম। কেবল এয়ারলাইন্স থেকে পুরো নাম। দিল্লির বাস্রা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস থেকে কাটা এয়ারটিকিট। কন্ট্যাক্ট ডিটেলস।

'লাজবন্তী সেন, আইজি সিআইডি, ওয়েস্ট বেঙ্গল।'

'হাই লাজবন্তী, অমৃতা বেদী হিয়ার। মনে আছে?'

লাজবন্তীর মনে পড়ে গেল, 'নিশ্চয়ই। আইপিএস ক্যাডারে এক বছরের জুনিয়ার ছিলে। দিল্লিতে কেমন লাগছে?'

'ফাইন। এটা আমার হোম টাউনও'

'কলকাতা আমারও।'

'তোমার খবর বলো'

'একটা মেয়ে নিয়ে গতানুগতিক বিবাহিত জীবন। অন্য একটা প্রফেশনাল দরকারে ফোন করলাম। দিল্লি-কলকাতা ফ্লাইটে আসা দিল্লির এক মহিলা, আত্রেয়ী ব্যানার্জি, এয়ারপোর্টে গুলিতে মারা গেছে। বাস্রা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস থেকে টিকিট কাটা এটুকুই জানা। অন্য কোনও আইডেন্টিটি মিসিং'

'অন্য কোনও ট্রেস?'

‘না। যখন প্লেনে উঠেছিল তখন নিশ্চয় ক্রেডেনশিয়ালস দেখাতে হয়েছিল। পাওয়া যায়নি। আন-আইডেন্টিফায়েড বডি বলে ছেড়ে দেওয়ার আগে পরিচয় খুঁজছি। বিশেষ করে যখন খুন। ওভাবে ছেড়ে দেওয়াও সমস্যা। নীড ইয়োর হেল্প টু ট্রেস হার। বাস্রা ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসকে চেক করে যদি কিছু বার করতে পারো।’

‘উইল ডু। ট্রেনিঙের সেসব দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনো মন কেমন করে’

‘তোমার খবর?’

‘ফাইন। বিয়ে করিনি। তা বলে ভার্জিন নই।’ খিকখিক করে হাসল।

একই পেশার দুজনের মধ্যে আউটলুকের ফারাক থাকতেই পারে। এখন আত্রেয়ী সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক। সমাধান বার করতে পারলে তৃপ্তি। আত্রেয়ীর কেসটাই মাথায়। সামান্যতম লিড থেকেও রাস্তা বার করতে হবে। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট, অমৃতার ফিডব্যাকই ভরসা।

ব্যালিস্টিক রিপোর্ট হকচকিয়ে দেওয়ার। আত্রেয়ীকে যে বুলেটে মারা হয়েছে তা ভারতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। ২.৩৪ এমএম ক্যালিবারের পিস্তল সুইশ মিনিগান দিয়ে। পিস্তলটা ছোট, সহজেই পকেটে বা লেডিস হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলা যায়। এমনিতে সাইজ ২ ইঞ্চির মতো, সঙ্গে ১ ইঞ্চি সাইলেন্সার। কাজে কোল্ট পাইথন ৩৫৭ ম্যাগনামের মতো। ভারতের মতো দেশে এর ব্যবহার অজানা। অন্তত রিপোর্ট তা-ই বলছে।

ভারতে সুইশ মিনিগান !!!

তাহলে কি খুনি বিদেশি কেউ, না পিস্তলটা স্মাগলড?

নিশ্চয়ই খুনি ভিক্টিমের কাছেই ছিল। হয়ত পাশেই ভিড়ের মধ্যে মিশে ফায়ার করেছে। যেহেতু অস্ত্রটা ছোট অনায়াসেই হাতের তালুতে লুকিয়ে নিয়ে নেওয়া যায়, অসুবিধে হয়নি। এত কাছ থেকে টার্গেটে হিট করলে বাঁচার চান্স মিনিমাম। মারা যাওয়া মেয়েটির পরিচয় জানতে পারলে এগোনো সম্ভব।

অমৃতা খোঁজ না দিতে পারলে গাঢ় অন্ধকার।

***

অস্তসূর্যের আলোয় ধোয়া আকাশকে অনুভব করছিল পাঞ্চেত জোংপা। বিচিত্র একটা গন্ধ জানান দিচ্ছে বৃষ্টি ঝেঁপে আসছে। বাইরের দরজা জানলা বন্ধ করল। পরনে রোজকার মতোই হাঁটু অবধি থক্র-দাম ইয়েনথাংসে। এলেনাকে ফোন করল, ‘কেমন আছো?’

এলেনা ভায়োলিন নামিয়ে বলল, ‘মনটা খুব খারাপ। ভীষণ বাবাকে মনে পড়ছে।’

‘ভয় পেয়ো না। তিনি না থাকলেও আমি তো সব সময় আছি তোমার সঙ্গে।’

‘জানি, আর জানি বলেই ভেতরে ভেতরে শক্তিও পাই। তোমাকে দ্বৈপায়নের কথা বলেছিলাম। শুনলাম আমার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার পর থেকেই তাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না’

‘পাওয়া যাচ্ছে না নয়, সে আর নেই।’

‘কী করে জানলে? ও তো কলকাতায়’

‘মন বলছে ওকে খুন করা হয়েছে।’

‘তাই?’ বিভ্রান্ত। কী বলবে ভেবে পেল না।

‘ধ্যানে বসে সব দেখতে পাই। অন্ধ হলেও ভগবান সেই দিক থেকে ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে। অনুভবে টের পাই। এক মহিলা ওকে মেরেছে।’

এলেনা অবাক। সভ্য জগৎ থেকে অত দূরে বসেও একজন মানুষ কীভাবে সব জেনে যেতে পারে, যা মানুষ এমনিতে সব শক্তি দিয়েও পৌঁছতে পারে না। এই মানুষটার সংস্পর্শে এসে সে অনেক কিছু জেনেছে, কিন্তু ধ্যানের যে এত শক্তি জানা ছিল না। যতই মানুষটা সবার থেকে দূরে থাকুক অন্তরের শক্তিতে দিয়ে কি এতখানি জানা যায়?

‘একটা যুদ্ধ যখন চলে তখন এরকম অনেক কিছুই ঘটে। মন খারাপ কোরো না। যুদ্ধ বলে কথা। সহজ নয়। মানুষ মরে, কত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। সবই বিবর্তনের অংশ। এসব দুর্ঘটনাকে শক্ত মনে গ্রহণ করতে হয়। অত সহজে ভেঙে পড়ার মেয়ে তো তুমি নও। ভেঙে পড়লে এসব তোমায় পেছনে টেনে রাখবে। ওঠো, জেগে ওঠো, সামনে যে অনেক কাজ। তোমায় যে অনেক কিছু করতে হবে।’

এলেনা মুষড়ে পড়ল। ভায়োলিনটা তুলে নিতে আর ইচ্ছে হল না। সে-ও তো মানুষ। দ্বৈপায়ন তার ছোট ভাইয়ের মতো। মনে হল কে যেন তার একটা হাত শরীর থেকে কেটে আলাদা করে দিয়েছে।

***

কোমরে ওগাল, মাথায় কুয়েতি গাহফিয়া, পরনে কুয়েতি দিশদাশা, আলঘানিম আঙুর চিবোতে চিবোতে টিভি দেখছিল।

‘কর্নেল গাদ্দাফি ডেড’

সোজা হয়ে বসল। বিদ্রোহীদের গুলিতে নিহত নেতার ছবি দেখাচ্ছে। বেজিং-এ তার বিজনেসের ডান হাত মন্ত ৎসে তুংকে ফোন।

‘খবর শুনেছ?’

‘কোন খবর?’ মন্ত ৎসে তুং অবাক।

‘কর্নেল গাদ্দাফি গুলিতে নিহত।’

‘তাই? সময় পাইনি। বিজনেস মিটিং চলছে’

‘প্রথমে মিশরে মুবারক। তারপর গাদ্দাফি। কী হচ্ছে কে জানে। কিছু আন্দাজ করতে পারছ?’ আলঘানিম জানতে চাইল।

মন্ত ৎসে তুং অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠছিল, ‘কেবল তোমার ওদিকে কেন? জাপানে দেখ না। বন্যায় অর্থনীতি ডামাডোলে। কোথাও বিক্ষোভের চোটে, কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কায় সবকিছু টলমল। মনে হচ্ছে সারা দুনিয়ায় একটা বিরাট বদল আসছে’

‘এর সুযোগ নিয়ে কিছু করতে না পারলে...’ আলঘানিম ফের আঙুরে কামড় দিল।

‘কীভাবে?’ মন্ত জানতে চাইল।

‘তোমার গোছানো দেশ। আমাদের অর্থনীতিও শক্তপোক্ত কেবল অপরিশুদ্ধ ক্রুড অয়েলের জন্যেই। তোমার কোম্পানি যদি এই ক্রুড অয়েল রিফাইনের কাজ করে আমরা কি গ্লোবাল ইকনমিটাকে ক্যাপচার করতে পারব না? ব্যবসাবুদ্ধি খাটিয়ে যদি কিছু করা যায়।’

‘ট্যাঙ্কারে তেল আনা-নেওয়া মানেই বাড়তি খরচ’ তুং ইতস্তত।

‘ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও’

মন্ত ৎসে তুং ভাবছিল আলঘানিমের সঙ্গে কম দিন তো কাজ করছে না। লোকটাকে বিশ্বাস না করার কোনও যুক্তি নেই। ফালতু মনে হচ্ছে না প্ল্যানটা। ও যদি কম দামে ব্যারেল দেয় চীন অর্থনীতিটা মুঠোয় নিতে পারে। চীন চুপিচুপি বিশ্ব অর্থনীতিতে ঢুকে পড়েছে।

‘মন্দ বলোনি। অ্যামেরিকা বাগড়া দেবে না তো? পরে যদি দেখা যায়...’

‘অক্সফোর্ডের বন্ধু অ্যামেরিকার ডেভিড ডাল্টনের সঙ্গে আগেই এ নিয়ে কথা হয়েছে। না ভেবে বলছি না। ডাল্টন প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে দৌড়োচ্ছে এমন একজন সেনেটরকে বাগে আনার চেষ্টায়। যদি সেনেটর এডোয়ার্ডস প্রেসিডেন্ট হয়ে যায় চিন্তা থাকবে না। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করছে ওকে তো দেখাতে হবে।’

‘দেখা হোক। এ ব্যাপারে কথা বলা যাবে। দেখা যাক সেনেটর এডোয়ার্ডস প্রেসিডেন্ট পদে কোথায়। বাড়ির খবর কী?’ মন্ত এ যদি-টদিতে বিশ্বাস করে না। বিজনেস ডিলের আগে দেখে নিতে চায় প্ল্যানটা কতখানি কার্যকরী।

‘বউদের না গার্লফ্রেন্ডদের?’

‘দুটোই’

‘চারটে বৌ যে যার ছলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত। পার্টনার না বদলালে একদিন ভায়াগ্রাতেও কাজ হবে না। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাই না। যেমন আছে থাক। বয়েস বাড়ছে। নিয়মিত প্র্যাক্টিস না থাকলে যন্তরপাতি বসে যাবে’

মন্ত ৎসে তুং হাসছে। আলঘানিম বদলাবে না। এমনিতে শার্প। ফুর্তির সঙ্গে ব্যবসা গোলায় না। ওর ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে কথা বলা সম্ভব হলেও ওর জিনিসপত্র ঠিকমতো কাজ করে কি না কেবল বিছানার সঙ্গীরাই বলতে পারে। ওর সঙ্গী নিয়ে সময় নষ্ট করতে আগ্রহী নয়। কেবল ব্যবসা বোঝে। ওটাই আসল।

ফোনটা কেটে দিল। গাড়িটা ব্যস্ত বেজিং-এর রাজপথে চলমান। প্রোপোজালটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মন্দ বলেনি। স্টাফদের প্রপোজালটার সম্ভাবনা যাচাই করতে দিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত শক্তি বাড়িয়ে প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি এভাবে ভারতকে টেক্কা দেওয়া যায় চীনের পক্ষে রক্ত না ঝরিয়েও বিপ্লব আনা সম্ভব ।

***

দিয়াকে সুবিমল জিজ্ঞেস করল, ‘কী কর?’

সুতির শাড়িটাকে কাঁধের ওপর ঠিক করে নিয়ে দিয়া বলল, ‘পড়াই। একটা মন্টেসরি স্কুলে।’

‘কদ্দুর পড়েছ?’

‘বারাসাত কলেজ থেকে বিএ।’

দু বোনের পোশাক-আসাকের ফারাক নজরের। রিয়ার মৃতদেহে পোশাক দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল মেয়েটা উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের। পরে পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় পরিষ্কার ওর লাইফ স্টাইল, চালচলন জামাকাপড়ের সঙ্গে পরিবারের আর্থিক অবস্থার কোনও মিল নেই।

‘তোমাদের সম্পর্ক কেমন ছিল? ক্লোজ?’

‘খুব একটা নয়। ও অন্যরকম জীবন যাপন পছন্দ করত। মাধ্যমিকের পরে পড়ালেখাই ছেড়ে দিল। বাবা-মা ওর চালচলন পছন্দ করত না। ছোট বোন। বাড়ির আদরের। একেবারে কী সম্পর্ক ছিঁড়ে দেওয়া যায়?’

‘তোমার থেকে কত ছোট?’

‘দু বছরের।’

‘বয়ফ্রেন্ড?’

‘অগুন্তি’ বলেই ফেলল দিয়া।

‘বিশেষ ক্লোজ কেউ?’

‘ঠিক বলতে পারব না। মিনুমাসির খুব প্রিয়পাত্রী।’

‘কে মিনুমাসি?’

‘যে স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ছিল, তার হেডমিস্ট্রেস।’

‘ওর মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছে?’

‘নিশ্চয়ই। তবে মিনুমাসিও এরকমই কিছু আশঙ্কাও করছিল। বড়লোক করলেই তো বড়লোক হয় না, ওদের ট্যাকল করতেও জানতে হয়।’

সুবিমল এবার সরাসরিই জিজ্ঞেস করল, ‘ও কি দেহ ব্যবসা করত?’

‘তাই তো মনে হয়। নইলে অত দামি দামি জামা-কাপড় পেত কোত্থেকে? বাড়িতেও টাকা দিত। স্কুলের সামান্য টাকা থেকে সম্ভব? মা-ও তা-ই বলা-কওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। যে টাকাটা দিত সংসারের খরচায় প্রয়োজন। আমি আর মা যা পাই তা দিয়ে এরকম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলা জিনিসপত্রের দামের সঙ্গে তাল রাখা মুস্কিল’

ওর যুক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জীবন এরকমই বিচিত্র। এমনকি না পছন্দ করলেও মেনে নিতে হয় স্রেফ প্রয়োজনের খাতিরেই। মেয়েটির কথায় নিম্নবিত্ত পরিবারের চিত্র স্পষ্ট। তার কাজ রিয়ার খুনিকে খুঁজে বার করা। সে তো আর সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়। সমাজ তার কথায়ও চলে না। সততা আর বাঁচার লড়াই আলাদা। দারিদ্র্য থেকে বাঁচার জন্য কী উপায় নিয়েছিল তার হদিশ বার করা জরুরি। তাহলেই রিয়ার হত্যা রহস্যের ওপর আলোকপাত হবে।

মিনুমাসি চাইলে হয়ত সে পথ দেখাতে পারে।

***

মিনুমাসির ক্লাস শেষ। যে ঘরে বসে সুবিমল সেখানে ঢুকল। পুরো নাম মিনতি ভট্টাচার্য। সুবিমল ওকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছিল। মধ্য তিরিশের, সবুজ পাড় সাদা সুতির শাড়ি। পুলিশের পোশাকে সুবিমলকে অপেক্ষায় দেখে অবাক।

রিয়ার কথা তুলে সুবিমল বলল, 'আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে। রিয়া তো আপনার স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার?'

'হ্যাঁ, পার্ট টাইম।'

'কেন, ফুল টাইম ভ্যাকান্সি ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু ও ফুল টাইম নিতে চায়নি। আমাদের স্টাফ কম। রাজি হলে, ভালোই হত।'

'কী মনে হয়, কেন ফুল টাইম নেয়নি? মাইনেও তো বেশি পেত।'

'ঠিক। কতবার বলেছি এতে ওদের পরিবারের উপকারই হবে। কিন্তু ও চায়নি।'

'বাকি অবসর সময়ে কী করত? যার জন্যে বেশি টাকার প্রলোভনও ছেড়েছিল?'

'ওর পারসোন্যাল ব্যাপারে নাক গলাতে তো পারি না। সময়ই বা কোথায়। স্কুলে এত কাজ...'

'ওর দামি পোশাক, জীবন যাপনের ধরণ চোখে পড়েনি?'

'পড়েছে। ওটা ওর ব্যক্তিগত এক্তিয়ার। হার ওয়ে অফ লিভিং। সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। আমি কী বলব? অনেকের তো অন্য ইনকামও থাকে। আমার কাজ স্কুলকে ঠিকমতো চালানো। এখানে যারা কাজ করে তারা কে ব্যক্তিগত জীবনে কী করছে দেখা আমার দায়িত্ব নয়।'

'শুনেছি ও আপনার খুব কাছের'

'কে বলল?'

'দিয়া।'

'খানিকটা। প্রায়ই বলত বাড়ি থেকে নাকি তেমন সাপোর্ট পায় না। ওকে নাকি সহ্য করে শুধুমাত্র বাড়তি আয়টুকুর জন্যে। ওর কী হল না হল তা নিয়ে কারোরই মাথাব্যথা নেই। আমি ধৈর্য ধরে শুনতাম। ব্যাস। এই জন্যেই অনেকে মনে করে আমি কাছের।'

'বন্ধুবান্ধব?'

'এখানে সুকান্তনগরে ছিল না বলেই জানি। তবে মধ্যমগ্রামের বাইরে কেউ ছিল কি না বলতে পারব না। থাকাই স্বাভাবিক। নইলে ওই লাইফস্টাইল মেন্টেন করত কীভাবে। সহকর্মী দিদিমনিদের সঙ্গে তেমন মিশতেও দেখিনি। কাজটুকু করেই চলে যেত।'

'কোথায়?'

'কী জানি। কলকাতাতেও যেতে পারে। আপনিই তো বললেন ওর বডি ওখানের ফ্ল্যাটে পাওয়া গেছে। হয়ত কলকাতায় অন্য কোনও চক্করে জড়িয়ে ছিল। ওখানে খোঁজ করলেই হদিশ মিলতে পারে।'

আচমকাই ওঠার আগে সুবিমলের মাথায় এল 'আপনার আদি বাড়ি?'

'আমরা বাংলাদেশের। এখানে এসে অ্যালবার্ট চৌধুরীর বাড়িতে কাজ করেছি। অবসর সময়ে ওর মেয়ে পড়িয়ে সাহায্য করেছে বলেই আজ এখানে। ওর সাহায্যেই মাধ্যমিক পাশ। কাজ করতে করতেই উচ্চ

মাধ্যমিক। তারপর ওখানকার কাজ ছেড়ে বারাসাত কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের পর এই স্কুলে। আস্তে আস্তে এখন হেডমিস্ট্রেস।’

‘ধন্যবাদ।’

সুবিমল বেরিয়ে এল। এখান থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। কলকাতাতেই মেয়েটার কাজকর্মের হদিশ খুঁজতে হবে। ফেরার পথে রিয়ার বাবা-মার কাছ থেকে ওর একটা ছবিও নিল।

সুবিমল বেরোবার পর মিনতি একটা নম্বরে ডায়াল করল, ‘কলকাতাতে আমাদের এক কলিগের মার্ডারের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে গেল’

‘কে খুন হয়েছে?’ ওপার থেকে কেউ জানতে চাইল।

‘রিয়া। এই স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার ছিল।’

ফোন কেটে গেল। আরেকটা মৃত্যু। আরো একটা ব্যর্থতা।

***

জেসিকা আর ফালতু সময় নষ্ট করল না। হোটেলে ফিরে তাড়াতাড়ি মালপত্তর গুছিয়ে জুরিখ এয়ারপোর্টের পথে ট্রেন ধরল। পুলিশ পরিচয় জেনে পেছনে লাগবার আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাওয়া হয়ে যেতে হবে। পুলিশের নজরে থাকাটা ঠিক নয়। যে কোনও সময় মিডিয়াতে হেডলাইন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ওরা ওদের তদন্তের কাজ চালিয়ে যাক। ও নিশ্চিত, এটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। নিশ্চিত, হিসেব করে খুন। রহস্যের চাবি সেই লোকটা যার সঙ্গে বিনোদ আগের দিন বিকেলে দেখা করতে গিয়েছিল। বিনোদ যে সে রাজনৈতিক নেতা নয়। সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী। তার কিছু হলে লোকাল আর আন্তর্জাতিক দুই মহলেই তোলপাড় ফেলতে বাধ্য। হেড লাইন হবেই। চিহ্নিত হওয়া মানে ওর রক্ষিতা হিসেবে লোকের নজরে পড়ে যাওয়া। তা মোটেই চায় না। বিনোদ মারা গেছে। ব্যাস, ওই চ্যাপ্টার ক্লোজড। তার জীবনে ওর আর কোনও জায়গা নেই। তাকে বাঁচতে হবে। এরকম কত লোক আসবে যাবে। বিনোদই কিংবা অন্য কেউ।

সুইশ রেলের কামরায় বসে ভাবছিল বিনোদ কি সত্যি সত্যিই শুধুই ফুর্তি করতে এসেছিল? অন্য কোনও ধান্দাও থাকতে পারে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ছক। সেদিন বিকেলে ওকে রেখে কোনও একটা বিজনেস ডিলে বেরিয়েছিল। সে রাতে হুইস্কিও তেমন খায়নি। অন্তত ওর হিসেবমতো নয়ই। মনে হয়েছিল ওই লোকটার সঙ্গে দেখা করে আসার পর আতঙ্কে।

ইন্দিরা গান্ধি ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছাড়ল। কার পার্কিং-এর দিকে যাওয়ার সময় কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছে। গাড়ির বুটে লাগেজগুলো ঢুকিয়ে চটপট পঞ্চশীল অ্যাপার্টমেন্টের দিকে ড্রাইভ।

যেটা খুঁজছিল, কাগজে চোখ বোলাতেই নজরে। মাউন্ট টিটলিসে বিনোদের মারা যাওয়ার খবরটা স্বভাবতই হেডলাইনে। খুবই ডিটেলসে - কীভাবে সুইশ কর্তৃপক্ষ ওর মৃতদেহের টুকরো উদ্ধার করেছে। মৃত্যুর কারণ সেভাবে কিছু বলা নেই।

খুঁজল। কোথাও তার কথা আছে কি না। নাঃ, কোথাও উল্লেখ নেই। কেবল লেখা, সুইশ কর্তৃপক্ষ পুরোদমে তদন্ত করছে। বাকি সব জানা যাবে ভারত সরকারের কাছ থেকে, তদন্ত শেষ হওয়ার পর। এ-ও বলা আছে, একদল হাই-প্রোফাইল সিবিআই অফিসার সুইশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই সুইজারল্যান্ডে যাত্রা করেছে। এই মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ভারত সরকার সব রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা নিচ্ছে।

ওর উপস্থিতি একমাত্র দিতে পারে কাস্তানিয়েবাম সুইশ কোয়ালটি সি হোটেলের কর্তৃপক্ষ। যদ্দূর মনে পড়ছে বিনোদ হোটেলে চেক ইন করেছিল মিসটার অ্যান্ড মিসেস কারাত হিসেবে। এটাই রক্ষে তার নাম উল্লেখ করেনি।

মনে পড়ল বিনোদ ওর ডিজিটাল ক্যামেরায় সুইজারল্যান্ডের ছবি তুলেছিল। সিবিআই চক্করে মোটেই জড়াবে না। যদি ওরা সামান্য হদিশও পায়, ঘাড়ে পড়বে। চটপট এসডি কার্ড ফরম্যাট করে সুইজারল্যান্ডে উপস্থিতির সামান্যতম হদিশটুকুও মুছে দিল। হারিয়ে গেল চোখ জুড়োনো সুইশ অ্যাল্পসের অসামান্য ছবিগুলো।

ক্লান্ত শরীরে জামাকাপড় ছেড়ে স্নানের ঘরে। ভালো করে স্নান সেরে শুধু একটু ঘুম। দুটো জোলাম ট্যাবলেট গিলে মোবাইলটা সুইচ-অফ করে দিল।

ঘুম ছাড়া স্ট্রেস কাটানোর আর কোনও ভালো ওষুধ নেই। ঘুমিয়ে পড়ল। ঈশ্বর জানে কতক্ষণ।

***

অনিমেষ দাস না শুনতে অভ্যস্ত নয়। কলকাতা পুলিশের অখ্যাতির শেষ নেই। দীপাঞ্জনা নামে এই মেয়েটার ওপর মায়া পড়ে গেছে।

দীপাঞ্জনাকে ধরল, ‘দ্বৈপায়নের কোনও ফোটো আছে?’

‘নিশ্চয়ই। নিয়ে যাচ্ছি।’

‘যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।’

চটপট ছবিটার কয়েকটা কপি করিয়ে ফেলল। লোক মারফত সেগুলো ওর সোর্সদের কাছে পৌঁছে গেল। পুলিস হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আনআইডেন্টিফায়েড বডির সঙ্গে ম্যাচ খুঁজছে। হোটেল হ্যামিলটন থেকে বেরিয়ে দ্বৈপায়ন কোথায় গেছিল বার করার চেষ্টায়।

ফিডব্যাক পেতে খুব দেরি হল না। সন্ধে সাতটা নাগাদ দ্বৈপায়নকে নিউ মার্কেট এরিয়ায় নিউ লিন্ডসে হোটেলে ঢুকতে দেখা গেছে। অথচ হোটেলের রিসেপশনে ওই নামে কোনও এন্ট্রি নেই।

রিসেপশনিস্ট বলল, ‘এরকম দেখতে একটি ছেলে চেক ইন করেছিল। নাম বলেছিল দীপাঞ্জন রায়। জানেন না তাকে ঘরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়?’

আচমকা শক! হোটেলের ঘরে গুলিতে মৃত্যু! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

তাহলে দ্বৈপায়ন আর এই দীপাঞ্জন একই লোক। নাম ভাঁড়িয়ে হোটেলে এসেছিল। কিন্তু কেন? দীপাঞ্জনার মুখটা পলকে ভেসে উঠল, ‘গুলিতে মারা গেছে?’

‘হ্যাঁ। ঘরেই গুলি খেয়ে পড়েছিল। লালবাজারে জানানো হয়। এনকোয়ারিও করেছে। যদ্দুর শুনছি বডি পোস্ট মর্টেমে।’ রিসেপশনিস্ট জানাল।

‘একা ছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘কেউ দেখা করতে এসেছিল?’

‘বলা কঠিন। টেরেসে রেস্তোরাঁ বার আছে বলে এত লোক যাচ্ছে-আসছে, ট্র্যাক রাখা অসম্ভব।’

‘কত নম্বর ঘরে উঠেছিল?’

‘রুম নম্বর ২০৬। লালবাজারে চেক করুন। ওরা তদন্ত করে গেছে। ভালো বলতে পারবে।’ একই কথা ফের না আউড়ে মহিলা কাজে ফিরতে চাইছে।

‘ঘরটা একবার দেখা যাবে?’

‘ওরা তো সিল করে গেছে। চাবিও ওদেরই কাছে।’

অনিমেষ দাস থানায় ফিরল। লালবাজারে খোঁজ করতে হবে। ছেলেটা ভুয়ো পরিচয়ে হোটেলে উঠেছিল জেনেই অবাক লাগছে। কেন? শেষমেশ যখন ছেলেটাকে পেয়েছে, সিআইডি তদন্ত করছে, ভবানী ভবন থেকে ডিটেলস পেতে অসুবিধে হবে না। হোটেল ডিটেলস আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকেই খুনের তদন্ত হবে। ভুয়ো পরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না। আসল নাম দ্বৈপায়ন। দীপাঞ্জনা আর এলেনা তাই বলেছে।

ওরা যদি আসল পরিচয় নিশ্চিত করতে না পারে কেসটা আনআইডেন্টিফায়েড বডি হিসেবে চাপা পড়ে যাবে।

রাতে মাথায় ঘুরছিল, পেছনে যদি কোনও ফিশি কিছু না-ই থাকে তাহলে ছেলেটা পরিচয় গোপন করল কেন? পরদিন সকালে আচমকাই মাথায় খেলে গেল ছেলেটা নিশ্চয় কম্পিউটার ব্যবহার করত। সেখান থেকে তো কোনও সূত্র মিলতে পারে।

দীপাঞ্জনাকে ফোনে ধরল, 'ও কি কম্পিউটার ব্যবহার করত?'

'অবশ্যই। যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করতে দিল্লি গেল মা একটা কম্পিউটার কিনে দিয়েছিল।'

'ওটা পাওয়া যাবে?'

'সিওর। আপনারা কী ওকে খুঁজে পেয়েছেন?'

'এখনো বলতে পারছি না। তদন্ত চলছে।'

কম্পিউটার পেতেই এক এক্সপার্টকে ধরল। কাজ শুরুর আগে সে বলল, 'Bios পাসওয়ার্ড হলে সমস্যা আছে। ক্র্যাক করা কঠিন। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ হলে কোনও ব্যাপারই নয়। মাইক্রোসফটের সিকিউরিটি তেমন স্ট্রং নয়। হয়ে যাবে।'

আধঘন্টার মধ্যে উইন্ডোজ টেনে ঢুকে গেল, 'এই নিন। এবার আপনার কাজ।' একটা কাগজে পাসওয়ার্ডটা লিখে এগিয়ে দিল, 'এই রইল পাসওয়ার্ড। রিস্টার্ট করতে আর সমস্যা হবে না।'

অনিমেষ নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সাব-ইন্সপেক্টরকে বলল আগামী দু ঘন্টা কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। কেসটা ক্র্যাক করতে পারলে সিওর প্রোমোশন। কবে থেকে আটকে। এবারও না হলে, কবে? ওসি হিসাবে বছরের পর বছর ঘসতে ঘসতে কাজে ইন্টারেস্টটাই চলে যাচ্ছে।

হটমেল, ইয়াহু, জিমেল, স্কাইপ মিলিয়ে দীপাঞ্জনের একগাদা অ্যাকাউন্ট। যদি এগুলোর প্রত্যেকটার পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করতে হয় অনিমেষের একার দ্বারা সম্ভব নয়। বিরাট ঝঞ্ঝাট। আবার এক্সপার্ট ডাকা। এর ওপর অফিসের কাজ তো আছেই। ভাগ্যক্রমে মেলগুলোর পাসওয়ার্ডগুলো কম্পিউটারেই সেভ করা। অধিকাংশ মেলই কোনও না কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন সংক্রান্ত। এগুলো আর বায়ো-ডাটা থেকে ওর পরিচয় নিশ্চিত। কয়েকটায় এলেনার সঙ্গে ওর অ্যাকাডেমিক বিষয় নিয়ে কথা। কোনও সন্দেহই নেই এলেনাকে খুব কাছের মানুষ বলেই ভাবত। এসব ই-মেল থেকে লিড পাওয়াটা নিছকই দুরাশা। আড়াই ঘন্টা গলদঘর্ম হয়ে যখন হাল ছেড়ে কেসটা সাইবার ক্রাইম সেলের হাতে ছাড়বে কি না ভাবছে, হঠাতই মাউসে ভুল করে হাত পড়ে স্কাইপ উইন্ডো খুলে যেতেই চমকে উঠল। এখানে দ্বৈপায়নের পরিচয়, দীপাঞ্জন নামে। তাহলে স্কাইপে সত্যিই নাম ভাঁড়িয়েছিল। বেল দিয়ে হাবিলদারকে ডেকে আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। এই দীপাঞ্জন রায়ের কাছ থেকেই ওর মৃত্যুর কারণের হদিশ মিলতে পারে।

***

বিনোদ কারাতের মারা যাওয়ার খবরটা দেখেই এলেনা প্রমোদকে মোবাইলে ধরল। এনগেজড। পাঁচ মিনিট বাদে ফের ফোন করেও একই ফল। এনগেজড। ষোলো বার ফোন করার পর লাইন পেল।

'এলেনা। তোমার বাবার মারা যাওয়ার খবরটা পেয়ে আমি শকড। ষোল বার ট্রাই করে শেষে পেলাম'

'কেবল কন্ডোলেন্স কল আসছে। কে জানে কত টেক্সট জমে আছে। তোমার গলা শুনে তা-ও ভালো লাগল। আমিও তোমায় কল করার সুযোগ খুঁজছিলাম।'

'আমায় কেন ?'

'বসে কথা বলতে হবে। খুব আর্জেন্ট। তাড়াতাড়ি হলেই ভালো।'

'ফ্রি আছি। তুমি সময় বার করতে পারবে?'

'করতেই হবে। আজ হলেই ভালো। একটু বাদে তোমার ওখানে যেতে পারি?'

'মোস্ট ওয়েলকাম।'

‘খিদেয় মরে যাচ্ছি। টেকঅ্যাওয়ে কিছু নিয়ে যাচ্ছি।’

‘এত আর্জেন্ট? কী ব্যাপার?’

‘দেখা হলে বলব।’ ফোন কেটে দিল।

সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে দুজনে ব্যাচমেট ছিল। এলেনা ওদের মধ্যে সবথেকে ব্রাইট। ইকনমিক্স নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করে এইওইতাই নিয়ে ছোটাছুটি না করে ছোট ফার্মে সেলস ম্যানেজারের কাজ নেয়। তার মতো ক্ষুরধার মস্তিষ্কের মেয়ের পক্ষে সত্যিই অবাক করা। পাঞ্চেত জোংপার কাছে পাওয়া শিক্ষার গুণে। পাঞ্চেতই শিখিয়েছে, ‘বস্তুগত সাফল্যই সুন্দর মানুষ গড়ে তোলে না। বরং তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে ফেলে। শান্তি বিঘ্নিত করে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজসম্পদ ত্যাগ করেছিল মানুষকে শান্তি, সঙ্গতি, প্রশান্তির পথ দেখাতে। যদি এর মূল কথাটুকু ধরতে পারো বুঝবে কী বলতে চাইছি। সবাই তো এই দুনিয়া থেকে কিছু নিতে চায়। মাত্র হাতেগোণা কিছু লোকই মানুষের সেবায় নিবেদিত করতে সংকল্পিত। আলাদা করে কোনও ধর্মকে অনুসরণ করতে হবে না। এই নিস্তারের উপায়। বুদ্ধ মধ্যপন্থায় বিশ্বাস করত। গুরু কর্মপা লামার কাছ থেকে তাই শিখেছি। শুধু তিনি কেন, আরিস্তোতলও এই দর্শনে বিশ্বাস করত, ‘ভারচিউ লায়েস ইন দ্য গোল্ডেন মিন’। যখন জীবনটাকে পুরো দেখবে বুঝবে এটা কত সত্যি। সব সময় সত্যের পথে থাকবে। বিনীত থাকবে। সাধারণ জীবনের মধ্যেই ঠিক পথ খুঁজে পাবে।’ এলেনাও তার জীবনে সেই শিক্ষাই অনুসরণ করতে চেয়েছে।

পোস্ট-গ্র্যাজুয়েশনের পর প্রমোদ আর পড়েনি। বড়লোক বাড়ির ছেলে। সুন্দরী মেয়ে, দামি মদ, স্পিডি স্পোর্টস কার নিয়েই ওর দুনিয়া। সমাজে স্বীকৃতির জন্য করতে বাবা কয়েকটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে ওকে বসিয়ে দেয়।

এলেনা ভাবে, দুজন দুই পথের যাত্রী হওয়া সত্বেও এতদিন ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব টিকল কী করে। যেহেতু ও এলেনাকে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ভাবে মনে মনে তাকে শ্রদ্ধাও করে। আজকের মতো এরকম দোলাচলে পড়লে এলেনাকে মনে পড়াটাই স্বাভাবিক।

***

প্রমোদ এল রাত দশটা নাগাদ, হাতে একটা ক্যারি ব্যাগ। ডাইনিং টেবলে খাওয়ারটা রেখে বলল, ‘ফোনের চাপে সারাদিন খাওয়া হয়নি। খিদেয় মরে যাচ্ছি, আগে খাওয়া। তারপর কথা’

ব্যাগটা নিয়ে এলেনা কিচেনে। দুজন মানুষ কতটা খেতে পারে টেনশনে সম্ভবত প্রমোদ খেয়ালই করেনি। যা এনেছে দুজনের দিন তিনেক দিব্যি চলে যাবে। যেটুকু দরকার এলেনা সেইটুকুই গরম করল। ডিনার সেরে প্রমোদ সোফায় এলিয়ে সিগারেট ধরাল। গোটা সন্ধে কেটেছে টেলিফোন আর মেসেজে শোকবার্তার জবাব দিতে। এলেনা কিচেনে ডিশগুলো রেখে প্রমোদের কথা শুনতে বসল।

‘পরামর্শের জন্যেই ছুটে এলাম। বাবা মারা গেছে মাউন্ট টিটলিসে। অ্যাক্সিডেন্টে। ঠিক? মিডিয়া জুড়ে সবাই খবরও করেছে। যদ্দুর ওকে চিনতাম মানা কঠিন। কেবল একবগগাই ছিল না, সঙ্গে সাবধানীও। আগামীবারের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারের জন্যে দৌড়চ্ছিল। এটা সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট মেনে নিতে পারছি না। অন্য কিছু।’

‘পড়লাম সিবিআই সুইশ কর্তাদের সঙ্গে কাজ করতে রওনা হয়ে গেছে।’ এলেনা তাকিয়ে।

‘সুইশ পুলিশ জানিয়েছে ওরা পরিবারের কেউ না গেলে বডি দেবে না। আমি ছেলে। আমাকেই যেতে হবে। মার অবস্থা তো বুঝতেই পারছ।’

‘গিয়ে নিয়ে এসো।’

‘ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারছি না। হতে পারি আমি বখে যাওয়া ছেলে। বাপের কুপুত্তুর। বাবার চোখের মণিও। শুধু সিবিআই কেন, কেউ ভিত্তিহীন গপ্পো শোনাবে আর আমায় তা মানতে হবে, এ হতে

পারে না। এর পেছনে কত কী থাকতে পারে। তোমায় ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি স্মার্ট। সত্যিটা জানতে সাহায্য করবে?'

এলেনা লজ্জা পেল, 'ওসব বোলো না। আমি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনও নই, মাদাম কুরিও নয়। সাধারণ মেয়ে।'

'চারপাশে রাজনীতির লোকজন বাদে যাকে একমাত্র বিশ্বাস করতে পারি, সে তুমি। কাল সকালে জুরিখের প্লেন ধরতে হবে। আমার সঙ্গে যাবে?'

'এত কম সময়! অফিস আছে।'

'ম্যানেজ করো, প্লিজ। তোমায় যেতেই হবে' প্রমোদ নাছোড়বান্দা।

'বসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। উনি ছুটি না দিলে... কদ্দিন লাগতে পারে?'

'কয়েকদিন তো বটেই। শেষ কাজের জন্যে বডি না নিয়ে ফেরা যাবে না।'

এলেনা বসের সঙ্গে কথা বলল। সব শুনে রাজি হওয়ায় দুজনেরই স্বস্তির নিঃশ্বাস, 'খুব বেশি হলে কদ্দিন লাগতে পারে?'

'দু-তিনদিন তো বটেই। ম্যাক্সিমাম চার।'

'তোমার মতো ভাগ্যি কারও দেখিনি। সব সময় যা চাইছ তা-ই হয়ে যাচ্ছে।'

'লোকে বলে সমস্যার পেছনে পেছনেই সমাধান। আমার ভাগ্য খারাপ হতে পারে?'

'দেখ কী হয়। আমি কেবল তোমার সঙ্গেই যাব, ব্যাস। ফ্লাইট কটায়?'

'ভোরে। লুফথানসায় টু ফ্র্যাঙ্কফুর্ট। কানেকটিং টু জুরিখ। সব গুছিয়ে রেখো। ৫টায় আসছি।'

কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে না নিলে চলবে না। বেরোবার আগে ট্র্যাভেল এজেন্টকে ধরল। সুপার প্রায়োরিটি বেসিসে এলেনার টিকিট চাই। বাবার কথা মাথায় রেখে এজেন্ট বেচারাও ট্যাঁফোঁ না করে তৎক্ষণাৎ বুক করে দিল।

ও চলে যাওয়ার পর এলেনা ভাবছে কী হয়ে গেল। কী করতে হবে মাথায় আসছে না। কলেজের বন্ধুত্বের কথা মাথায় রেখে প্রমোদের কথা ফেলতে পারেনি। এত কিছুর মধ্যেও ভালো লাগছে। পাঞ্চেত জোংপার কাছে শেখা অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথে হয়ত কিছুটা এগোনো হল।

***

'খবর আছে' হট লাইনে অমৃতা বেদি।

লাজবন্তী একটা মিটিং থেকে বেরিয়েছে। দিনের কাজ শেষের পথে। এই সময়ে সিনিয়র পুলিস অফিসারদের ডিরেক্ট নেটওয়ার্কে ফোনটা।

কপাল থেকে ঘাম মুছল, 'কী খবর?'

'তোমার ভিক্টিম আত্রেয়ী ব্যানার্জিকে ট্র্যাক করা গেছে। বসরা ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলসকে চেক করতেই চিনল। আরকে পুরমের বাসিন্দা। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে মাস্টার্স। প্রতিবেশীদের কথা অনুযায়ী বেশ অ্যাট্রাক্টিভ। বাবা আইএফএস সার্ভিসে। আরকে পুরমের বাংলোয় থাকত। এক বছর আগে বাবা অ্যামেরিকায় ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে সেকেন্ড ম্যান হয়ে চলে গেছে। তারপর থেকে একা ওখানেই, এক ঝির সঙ্গে।'

'দিল্লিরই মেয়ে?'

'দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্সে পড়েছে।'

'কলকাতায় কী করতে আসছিল?'

'পরে আসছি।'

লাজবন্তী অ্যালার্ট। অমৃতা আগ্রহ উস্কে দিয়েছে। অপেক্ষায় পরের কথা শোনার জন্য। ও আইপিএসে টপার। অমৃতা পরের বছর। পুলিসের প্রতিভাবানরা যত এরকম কেসে মাথা ঘামায় ততই ভালো।

'বড়লোকি লাইফস্টাইল।'

‘বয়ফ্রেন্ড?’

‘সবসময় একজনের সঙ্গেই যে ঘুরত, তা নয়। তবে একটা বাঙালি ছেলের ঘনিষ্ঠ ছিল। এখুনি নামটা বলতে পারছি না। আমার লোকেরা খুঁজছে। কিছুদিন হল বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিল কম। ছেলেটার সঙ্গে কিছু হয়ে থাকতে পারে।’

তাহলে কি ছেলেটা দিল্লিতে নেই। হয়ত কলকাতায় ওর সঙ্গেই দেখা করতে আসছিল। ছেলেটাকে তো খুঁজে বার করা দরকার। তদন্তে সাহায্য করতে পারবে।

‘গার্লফ্রেন্ড?’

‘খাতিয়ে দেখছি। ছেলেটা রোজ ওর বাড়ি আসত। সবার আন্দাজ ওরা স্টেডি রিলেশনে ছিল।’

খবর বেরচ্ছে।

একে খুজে পেলেই লিড পাওয়া সম্ভব। আপাতত ব্যালিস্টিক রিপোর্ট আর ইন্ডিগো ফ্লাইটের ডিটেলস হাতে। মেয়েটার পরিচয় জানা ছিল না। জানা গেল। বাড়ির হদিশও। অমৃতা হয়ত আরও কিছু সাহায্য করতে পারবে।

অফিস থেকে বেরোনোর আগে একটা ল্যাপটপ নিয়ে ডিআইজি, সিআইডি ঘরে। বাড়িয়ে বলল, ‘ভবানীপুরের ওসি এটা পাঠিয়েছেন।’

‘কার নোটবুক?’ লাজবন্তী অবাক।

‘দিন কয়েক আগে মিসিং হওয়া একটা ছেলের। ওর বোন দীপাঞ্জনা এটা দিয়ে গেছে। চোখ বোলালেও কম্পিউটারে অভ্যস্ত না হওয়ায় বুঝতে পারেনি।’ একটা স্লিপ এগিয়ে দিল, ‘নাম অনিমেষ দাস। এখানে কনট্যাক্ট নাম্বার। আপনি বললে এটা আমাদের কম্পিউটার এক্সপার্টের কাছে পাঠাব, না কি আগে একবার দেখবেন?’

ওসি কেন ল্যাপটপটা পাঠাতে গেল বুঝতে পারছে না। কোথায় কে মিসিং হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। আচমকা একটা কথা মাথায় খেলে গেল। অমৃতা ও তো একটা ছেলের কথা বলছিল। নিশ্চয়ই বাঙালি। এ সে নয় তো? লাজবন্তী কম্পিউটারে বেশ সড়গড়। রাতে সময় পেলে দেখা যাবে একই লোক কি না।

‘কী নাম ওসির?’

‘অনিমেষ দাস।’

‘ডিটেলসটা জানলে সুবিধে হত’

ডিআইজি সিআইডি অনিমেষের পাঠানো রিপোর্টের ফোটোকপিটা এগিয়ে দিল, ‘রিপোর্টের সঙ্গে পাসওয়ার্ডটাও আছে।’

কম ধকল যায়নি সারাদিন। চাইছিল বাড়ি ফিরে মেয়েরকে নিয়ে বসতে। নোটবুক, রিপোর্ট, অনিমেষের কন্ট্যাক্ট নম্বর সব ব্রিফকেসে ঢোকাল, ‘ঠিক আছে। দেখছি। সময় পেলে দেখে নেব। সন্ধে ভালো কাটুক।’

ফর্ম্যাল বিদায় সম্ভাষণের পর বেরিয়ে পড়ল।

***

বেডসাইড টেবল থেকে ক্রিস্ট’ল সিগারেট ধরাল। সন্তোষজনক সঙ্গমের পর রসের প্লাবনের পর আয়েস করে সিগারেটে টানেই অভ্যাস। সঙ্গম শেষে পরিতৃপ্ত রেইনার পাশেই আপীত এলিয়ে। সেক্সটা ওর রোজকার চাহিদা, বিক্ষিপ্ত অভ্যাস নয়। ক্রিস্ট’ল বা অন্য কেউ। দৈহিক পরিতৃপ্তি নিয়ে কথা।

হ্যামবুর্গ ম্যানসনের কিং সাইজ খাটে শুয়ে মাথায় অন্য চিন্তা। মার্কের কাছ থেকে ‘মিশন অ্যাকমপ্লিশড, থ্যাঙ্কস’ টেক্সটটা আসতেই মুখে হাসি। মানে, জনের কাজ শেষ। তার পুরুষাঙ্গ ক্রিস্ট’লের হাতযশে আজকের মতো শান্ত। কাল অন্য কেউ। থার্ড রাইখের জয় হোক।

১৯২৯-এ প্রথম মহাযুদ্ধের বিধ্বস্ত জার্মানির মধ্যে থেকে অ্যাডলফ হিটলার উঠে এসেছিল। ইয়োরোপে থার্ড রাইখের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। বিশ্বে সারা ফেলার মতো ইয়োরোপ পেরিয়েও ক্ষমতার বিস্তার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে থার্ড রাইখের পতনে জার্মানি তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে এখন ইইসির অংশ। ফের সময় হয়েছে সারা বিশ্বে হোক না হোক অন্তত ইয়োরোপে আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার। ব্রিটিশদের মতো কবে ঘি খেয়েছিলাম আঙুলে তার গন্ধ শুঁকে থাকার মানসিকতা নেই। নীল রক্তের বড়াই নিয়ে যে বাঁচতে চায় বাঁচুক। মার্ক হেনলির ওপরে আগামী দিনগুলোর কথা ভাবছে।

কিছুক্ষণ আগের আনন্দচ্ছ্বাসের সোয়াস্তিতে মসগুল হয়ে থাকার সময় নয়। বরং দেশটাকে ফের দাঁড় করানোর চেষ্টা করাই ভালো। তার জন্যে দুনিয়া জুড়ে লোক ছড়িয়ে দিয়েছে। যেভাবেই হোক জার্মানির সুদিন ফেরাতে হবে। আত্রেয়ী আর তার প্রেমিককে বিপুল খরচ করে বালিতে ছুটি কাটাতে পাঠিয়েছে। আত্রেয়ীর মতো বিশ্বব্যাপী অনেক যুবতিই ওর পৃষ্ঠাপোষকতায় সুবিধা উপভোগের সঙ্গে, ওর চরও। রাইনল্যান্ডের পুনরুত্থানে তাদেরও আলিখিত অবদান।

বালি!

জাভা আর লম্বকের মধ্যেখানে সুন্ডা দ্বীপপুঞ্জের সুদূর পশ্চিমে ট্যুরিস্টদের চোখের মণি ইন্দোনেশীয় দ্বীপ। প্রাচ্যের স্বর্গ।

বালিতে কারাং পুতি ভিলার মতো প্রাইভেট কটেজে দ্বৈপায়নের সঙ্গে আত্রেয়ীর ছুটি কাটানোর স্বপ্নটা কখনো সত্যি হবে ভাবতে পারেনি। পছন্দের মানুষের সঙ্গে বাটলার, শ্যোফার, এয়ার-কন্ডিশনড গাড়ি, ম্যাসাজ, এক্সকুইজিট স্পা, বিউটি ট্রিটমেন্ট সব নিয়ে মন ভরান অফার। বেলতলা রোডের বাসিন্দা দ্বৈপায়নের স্বপ্ন, বাস্তবে। আত্রেয়ীকে ভালোবাসে। একসঙ্গে ছুটি কাটানোর আকর্ষণই আলাদা। যুগ্ম পরিতৃপ্তি তো বটেই। দৈহিক তৃপ্তিও কাম্য।

‘কেন নয়?’

‘বিয়ের আগে ওসব নয়। বিয়ে অবধি অপেক্ষা করতেই হবে।’

‘কে জানছে?’

‘আঃ, বলছি না, এটাই আমার নীতি। এই ছটফটানিটাও উপভোগের’ সমুদ্রতীরে সাদা সুতির লুঙ্গি, লাল টপে ওকে আগুনের মতো লাগছিল।

এন্ট্রান্সের মুখে বুদ্ধের মূর্তি। টিলা থেকে তাকালেই চোখে পড়ে নিচে ১৩,০০০ স্কয়ার মিটার ছড়ানো করং পুতি এস্টেটকে পরিবেষ্টন করা অখণ্ড সবুজ ফুলের সমারোহ। এ যেন মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের ছোঁয়া। ভিলা থেকে তাকালে মনে হয় দুনিয়া থেকে বহুদূরে, অন্য কোনও ভুস্বর্গে। মনোরম সৌন্দর্যের পরিব্যাপ্ত নয়নাভিরাম দৃশ্য। নিচে সর্পিল পথ চলে গেছে মূল সৈকতে ভারত মহাসাগর সংলগ্ন বীচ ক্লাবে। উঁচু সিলিং দেওয়া বড় ঘরগুলোয় অসীমের অনুভূতি। চতুর্দিক দুর্মূল্য এশিয়ান অ্যান্টিকে মোড়া। সঙ্গে একটা হেলিপ্যাডও।

কৌতূহলী দ্বৈপায়ন প্রশ্ন করেছিল, ‘নিশ্চয় প্রচুর খরচ। এত সব তোমার বাবার টাকায়!’

‘ডলারে রোজগার করে,’ সত্যি লুকিয়ে জবাব। এই ট্রিপটা কে স্পন্সর করছে জানাতে চায় না। বিপদ হতে পারে। দ্বৈপায়নকে ভালোবাসে। ছুটিতে শুধু ওর সঙ্গে চুটিয়ে এনজয় করা। মনপ্রাণ যখন ওকে চাইছে সামান্য কারণে দূরে থাকা অর্থহীন। সেক্স ছাড়াও ওকে হারাতে চায় না। পঞ্চেন্দ্রিয় এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এতই সজাগ যে প্রবর্তন নিয়ে চিন্তার অবকাশ নেই। জীবনে তো এমন বিলাসিতা আগে উপভোগ করেনি। সেক্স অপেক্ষা করতে পারে, আনন্দ নয়।

ক্রিস্ট'লের সিগারেট শেষ। ব্লাডার ভর্তি। কম্বলটা সরিয়ে নগ্ন অবস্থায়ই পেচ্ছাপ করতে টয়লেটে। রেইনার এই ম্যানসনে হাঁটাও অনেকখানি। ওর ঢেউ খেলান শরীরের উচ্চাবচ ছায়া বেড ল্যাম্পের আলোয় অলৌকিক। উৎসাহহীন রেইনার ফাঁকা চোখে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে। মাথার ভেতরে একটাই চিন্তা। কাল কে সেটা প্রশ্ন নয়। আদালা, ক্লারিমন্ড বা গিজেলা যে-ই হোক তফাৎ নেই। যৌনতা নতুন আইডিয়ার জন্ম দেয়। নতুন চিন্তা মাথায়। অদূর ভবিষ্যতের একটা সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বাস্তবের চেহারা নিচ্ছে।

যেভাবেই হোক নিজের দেশকে ভবিষ্যতের ক্ষমতায় দেখতে হবেই।

***

কাজের মহিলা চলে যাওয়ার মিনিট দশেক বাদে পঞ্চশীল অ্যাপার্টমেন্টে জেসিকার দরজায় বেল। কাফতানে জেসিকা কয়েক পা হেঁটে ভিডিওফোনে। অচেনা মুখ।

'কে?'

'লুই ব্রাগাঞ্জা।'

'আপনাকে চিনি?'

'না। আমি ইন্সিওরেন্স এজেন্ট। কথা বলতে এসেছি।'

'দরকার নেই।'

'ম্যাম, মাত্র দশ মিনিট, প্লিজ। পছন্দ না হলে চলে যাব।'

'বললাম তো, সময়ও নেই, দরকারও নেই' ক্যামেরা সুইচ অফ করে সরে এল।

জুরিখ থেকে ফিরে কারও সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা নেই। অ্যাপার্টমেন্টে দরজা বন্ধ করে মিডিয়ায় কারাটের কভারেজ দেখছে। ফিরে উদ্বিগ্ন অবস্থায় কারও সঙ্গে দেখা করেনি। বিনোদ পরিচিত মুখ, সাধারণ কেউ নয়। জেসিকার সঙ্গে ওর যোগাযোগের কথাও কম লোকই জানত। যদি সামান্য সন্দেহ হয় শেষকৃত্যের পর পুলিস ছিঁড়ে খাবে। প্রথমে ভেবেছিল দেশ ছেড়ে পালাবে। পরে ভেবে দেখেছে এ সময় হাওয়া হলে লোকের সন্দেহ হতে পারে। তখন আরেক বিপদ। তার থেকে বাড়িতেই ঘাপটি মেরে কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়া শ্রেয়। উদ্বিগ্ন অবস্থায় একা ঘরে থাকাটাও কঠিন।

শপিং, পুরুষ সঙ্গ আর উত্তেজনার টান যতই কুরে কুরে খাক বাইরেটা একটু শান্ত না হলে বেরোনো নিরাপদ নয়। মোবাইলের সুইচ অফ করে দিল। এখন একাই থাকতে হবে।

দিন কয়েক বাদে কাজের মেয়েটি কাজ সেরে যাওয়ার পর, ফের বেল। আবার সেই লুই ব্রাগাঞ্জা।

'বললাম না, উৎসাহী নই।'

'ম্যাম, এটা স্পেশাল পলিসি। ১০টা মিনিট ম্যাম...'

'না। ফালতু ডিস্টার্ব করবেন না।'

ব্রাগাঞ্জাকে হটিয়ে জেসিকা হাঁফ ছাড়ল। মাথায় ঢুকছে না লোকটা কেন তার পেছনেই পড়েছে। বিরক্ত লাগছে। সঙ্গে উদ্বেগও। পুলিসের কেউ নয়ত? বিনোদের পলিটিক্যাল কেউও হতে পারে। কারও থেকে রিলিফ পাওয়ারও উপায় নেই। স্বাধীন মেয়ে। একাই এই ঝামেলা থেকে বেরোতে হবে। বিনিদ্র কয়েকটা রাত কাটবার পর ব্রাগাঞ্জা যখন তৃতীয় বার ফোন করল তখন আর সন্দেহই রইল না। এ ইন্সিওরেন্স এজেন্ট হতে পারে না। বারবার তাকে ধাওয়া করার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনও ধান্দা। মনঃস্থির করল দিল্লি ছাড়তে হবে।

কাজের মেয়েটিকে জানাল অনির্দিষ্টকালের জন্যে বাইরে যাচ্ছে। নেট ঘেঁটে দেখল রাতে ৯:৩০ ও ১০:৩০শে দুটো ইন্ডিগো ফ্লাইট থাকলেও ভর্তি। পালাতে মরিয়া। দিল্লি থেকে বেরোবার জন্যে যত খরচই হোক, রাজি। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এটিএম থেকে টাকা তুলতে যাওয়ার পথে লক্ষ করল বাইরে একটু দূরেই একটা গাড়ি পার্ক করা। শিরদাঁড়া বেয়ে হিম স্রোত। কেউ নিশ্চয়ই ফলো করছে। বাড়িতে আর নিরাপদ নয়। ভোর ৫টা ১০-এর ইন্ডিগো ফ্লাইটেই সিট বুক করে ফেলল। মুম্বই পৌঁছচ্ছে সকালে ৭টা ২০ তে।

জানলা দিয়ে দেখল ফ্ল্যাটের উলটোদিকে গাড়িটা পার্ক করানোই। পরিস্কার দেখা না গেলেও অন্ধকারেই বুঝল স্টিয়ারিংএ বসা লোকটা লুই ব্রাগাঞ্জা।

ওর ওপর নজর। যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে। নার্ভাস জেসিকার আতঙ্কে হাত-পা ঠান্ডা। বাড়িতে একা। রক্ষা করতেও কেউ আসবে না। এই পশ এলাকার ফ্ল্যাটগুলোয় লোকে পাশের ফ্ল্যাটের খবর রাখে না। মাঝেমধ্যে লিফটে বা লবিতে দেখা হলে হাই হ্যালো-টুকু, ব্যাস। আতঙ্কের চোটে ঠিক করল দিল্লি এয়ারপোর্টেই রাতটা কাটিয়ে দেবে। সেটাই সবথেকে নিরাপদ। সেখানে কেউ কিছু করতে এলে অন্তত সাহায্য পাবে। বেরিয়ে যাবে ঠিক করে, বোরখা পরে মালপত্র গুছিয়ে নিজের চেনা ভাড়াগাড়ি ডাকল। রাত ১২টায় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সোজা দিল্লি এয়ারপোর্টে।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসেও আতঙ্ক। বোরখায় লোকান মুখে চারদিকে নজর। অধিকাংশই যে-যার চেয়ারে ঢুলছে। কয়েকজন কফি শপের আশেপাশে ঘোরাফেরায় ব্যস্ত। একজন যেতে যেতে পাশেই দাঁড়াল। তাকে মাপল। এক মুহূর্ত। পরক্ষণেই এগিয়ে গেল লোকটা। সামনের রোয়ে এক মহিলা বসে ঘুমচ্ছে। আচমকা জেগে উঠে তার দিকে চেয়ে। এত রাতে এয়ারপোর্টে বোরখা পরে মহিলা দেখে অবাক। দৃষ্টিতে মাপছে। নার্ভাসনেসটা ফের ফিরে এসেছে। সকাল অবধি এখানেই থাকতে হবে। এত ঝামেলার মধ্যে ঘুমও আসছে না। কতক্ষণে সিকিউরিটি চেক শুরু হবে সেই অপেক্ষায়।

প্যাসেঞ্জারদের দৌড়োদৌড়ি দেখে মনে হল বোধহয় কোনও ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট এসেছে। ভিড়ে লবিটা ভরে গেল। উদ্বেগও মিলিয়ে গেল। সব ভুলে লোকগুলোকে দেখছে।

ইন্ডিগো ফ্লাইটের সিটে বসে নিশ্চিন্ত।

সমস্যার হাত থেকে যেন রেহাই নেই।

স্যান্টা ক্রুজ এয়ারপোর্টে নেমে আরেক ধাক্কা। পেট্রলের দাম বাড়ার প্রতিবাদে বাস ট্যাক্সি সব বন্ধ। ভেবে পাচ্ছে না কীভাবে হোটেলে যাওয়া যায়। পাশের সিটের মহিলারও একই হাল।

‘স্ট্রাইক জানলে কে আজকের ফ্লাইট ধরত। দেরি হয়ে গেছে। যে করেই হোক নটার মধ্যে ফ্ল্যাটে পৌঁছতে হবে। গুচ্ছের বিজনেস অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মিস করলে প্রচুর ক্ষতি। ফ্ল্যাটে পৌঁছতে পারলে ড্রাইভ করে চলে। কিন্তু, পৌঁছব কী করে?’ বকছিলেন মহিলা।

‘কোথায় থাকেন?’

‘বান্দ্রা রিক্ল্যামেশন’ কথা বলতে বলতেই মহিলা মোবাইলে কাউকে ধরতে পাগলের মতো চেষ্টা করছে। শেষ অবধি পাওয়া গেল, ‘আজকে স্ট্রাইক জানতাম না। খুব ঝামেলায় পড়েছি। এয়ারপোর্ট থেকে পিক আপ কর, প্লিজ...’

এক মুহূর্ত চুপ। মহিলা ফোন কেটে দিল। জেসিকার দিকে ফিরে বলল, ‘আমার পরিচিত প্রাইভেট হায়ার কার কোম্পানি। বলল নিয়ে যাবে। দামটা বেশি পড়বে। কী করা যাবে। নটার মধ্যে পৌছনোটা জরুরি। আপনি কোথায়?’

‘জানি না। ভদ্রসভ্য হোটেল খুঁজতে হবে’

‘খরচটা কী ফ্যাক্টর?’

‘না, যদি ভালো জায়গা হয়।’

‘একটা ফাইভ স্টার হোটেল আছে আন্ধেরি ওয়েস্টে, লিঙ্ক রোড থেকে নেমে ওবেরয় কমপ্লেক্সে। সভেন্সকা হোটেল। একটু দামি ঠিকই, কিন্তু হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে গেলে আইডিয়াল। কদ্দিন এখানে?’

‘কয়েকটা দিন। কাজ আছে।’

‘তাহলে সভেন্সকাই দেখুন। বান্দ্রা রিক্ল্যামেশন থেকে খুব দূরেও না। ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দিতে পারে। হোটেলটা ও চেনে। যাবেন আমার গাড়িতে?’

জেসিকা এক মুহূর্ত ভাবল। এ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। টাকাটা বড় কথা নয়। এই স্ট্রাইকের মধ্যে ভালো একটা হোটেলে গা ঢাকা দেওয়াটাই মুখ্য। কাল রাতে ঘুম হয়নি। দু-চোখ বুঁজে আসছে। সম্মতিতে মাথা নাড়ল।

ঘন্টাখানেক বাদে যখন অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত, গাড়িটা এল। দুজনে চটপট গাড়ির বুটে যে যার মাল তুলে ব্যাকসিটে। এই ভোরে গাড়ির তেমন ভিড় নেই যা অন্য সময়ে থাকে। মুম্বাইয়ের খালি রাস্তা দিয়ে ড্রাইভটাও সুন্দর। গাড়ির সিটে শরীর এলিয়ে জেসিকা বহিরদৃশ্য উপভোগে নিমগ্ন। বান্দ্রা রিক্ল্যামেশন জায়গাটা পশ। এখানে ফ্ল্যাট মানে মহিলা নিশ্চয়ই বড়লোক।

মেয়েদের যেমন অভ্যাস, মনে মনে নিজের সঙ্গে ওর তুলনা করছে - কে বেশি সেক্সি? রায়টা একজন পুরুষই দিতে পারে। আধুনিক হলে দুজনের প্রতিই আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। পুরুষগুলো এমনই করে। গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরের ঘরবাড়ি, দোকানপাট দেখছে। অনেকগুলো খুলে গেছে, যদিও খদ্দেরের ভিড় শুরু হয়নি। কিছু খোলেনি। দেখতে দেখতে নিজের চিন্তায় মগ্ন। দিল্লি ছাড়াটা ভালোই হয়েছে। নিরাপত্তার ছায়া অনুভব করছে।

ভাবনার মধ্যে তলিয়ে। সম্বিৎ ফিরল মাথায় সজোরে বারি খেয়ে। মনে হল, ভারী কিছু দিয়ে ওর মাথায় কে যেন আঘাত করল। মুহূর্তের এক ভগ্নাংশে সব অন্ধকার। রক্তের পুকুরের মধ্যে জানলার দিকে জেসিকার মাথাটা এলিয়ে পড়ল।

গুলিতে মারা গেছে!!!

পাশের মহিলা ড্রাইভারকে বলল, ‘ফ্ল্যাটে নয়, জানো তো কোথায় যেতে হবে’

ড্রাইভার হেসে স্টিয়ারিং হুইলে ঝুঁকে বলল, ‘যা বলবেন’

***

মিসেস হিলারি হ্যামিলটন স্বামীর খুন হওয়াটা মানতে পারছিল না। যদিও ভারতের পুলিস তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, তার স্বামীর সঙ্গে দুনিয়া জুড়ে যাদের যোগাযোগ তাদের কথাই ভাবছে। শেষবার, যখন ওরা একসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়ার র‍্যাঞ্চে, জ্যাক হ্যামিলটনের সঙ্গে ভারতের এক মঙ্ক আর আরবের এক শেখের আংশিক কথাবার্তা কানে আসে। শেখের সঙ্গে কথাবার্তার যেটুকু কানে এসেছিল তাতে মনে হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্যের কিছু নিয়ে কথা হচ্ছে।

যেখানেই যেত সব জায়গায় নোটবুকটা নিত্যসঙ্গী। ফেরত আসা জিনিসপত্রের মধ্যে নোটবুকটা নেই। শোক, শেষকৃত্যের ঝামেলায় এ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেনি। এখন র‍্যাঞ্চে স্বামীর শেষদিনগুলোর স্মৃতি মন্থন করতে গিয়েই খটকা।

হ্যাঁ, নোটবুকটা তো নেই।

অবিনাশের সঙ্গে যোগাযোগ করল। ভারতে যদিও অনেক রাত, ‘অসময়ে বিরক্ত করলাম’

‘একেবারেই নয় ম্যা’ম। আমাদের কাজে কোনও অসময় বলে কিছু নেই।’

‘ওর ফিউনারালে ব্যস্ত ছিলাম। সময় পাইনি। এখন ওর জিনিসপত্র খুলে দেখছি ওর নোটবুকটা নেই।’

‘হয়ত ভারতে আনেনি।’

‘নাঃ। পরিষ্কার মনে আছে নিয়ে গেছিল। যেখানেই যেত ফোরজি হটস্পট শুদ্ধ নিয়ে যেত। এবারও তাই।’

অবিনাশ বিশ্বাস করল। হতেই পারে তদন্তের মূল ওই নোটবুকে। ওটা খুঁজে পেলে হয়ত বোঝা যাবে সিকিমে না গিয়ে কেন বেনারসে। হোটেলে নোটবুকের হদিশ মেলেনি। ওটা খুঁজে বার করতে হবে।

‘ভাইটাল ক্লু। খুঁজে দেখতে হবে।’ অবিনাশ ফোন ছাড়ল।

কাছের মানুষ বাদে। জ্যাকের মৃত্যুর পর যাদের ফোন পেয়েছে সে ডেভিড ডালটন। যদিও ওর মৃত্যু সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল না। মানে ওর সাম্প্রতিক ডিলগুলোর সঙ্গে ডেভিডের যোগ ছিলনাই মনে হয়। নাকি ও কিছু চেপে যাচ্ছে? মানুষের মন পড়ার ক্ষমতা হিলারির নেই।

‘নোটবুকটা পেয়েছ?’ আলঘানিম মুজিবুর রহমানকে জিগ্যেস করল।

‘হ্যাঁ।’

‘তাড়াতাড়ি আমার আবুধাবির বাংলোয় নিয়ে এস।’

‘আগামী যে ফ্লাইট পাব, তাতেই আবু ধাবি পৌঁছব। কি করছি জানাব।’

আলঘানিম ফোন কেটে দিল। জ্যাক হ্যামিল্টনের সঙ্গে ওর কোনও যোগাযোগ ছিল না। জানত ডেভিড ডালটন ওর সঙ্গে জড়িয়ে। দুনিয়া জুড়ে অ্যামেরিকার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে এজেন্ট চাই। জ্যাক এরকমই অনেকের একজন। নাগরিক হিসেবেও কাছের। ওর ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচুর যোগাযোগ। ডেভিডকে আলঘানিম বলেছিল জ্যাকের যেহেতু ভারতের সঙ্গে যোগ আছে, ওকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে। ডেভিড রাজি। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। মুজিবুর রহমান নামে একজন ভারতীয়কে জ্যাকের ওপর নজর রাখতে লাগায়।

দিল্লিতে হোটেল অশোকার ডাইনিং হলে মুজিবুর জ্যাকের সঙ্গে আলাপ জমায়, ‘কোথায় চললে?’

‘উত্তর-পূর্বে’ জ্যাকের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

‘উত্তর-পূর্ব কেন?’

‘ভারতের একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। আমি বৌদ্ধদের বিষয়ে আগ্রহী। উত্তর-পূর্বে অনেক জ্ঞানী মঙ্কের দেখা মেলে’

‘যখন বৌদ্ধদের বিষয়ে আগ্রহী, নিশ্চয়ই বুদ্ধ যেখানে জন্মেছিলেন সে জায়গাটা দেখতে চাইবেন?’

‘বুদ্ধ তো সারনাথেই প্রথম জ্ঞান লাভ করেন। ওখানে কখনো যাইনি।’

‘আপনার জায়গায় আমি হলে প্রথমেই সারনাথে দৌড়তাম। বেনারস থেকে মাত্র ১০ কিমি। বেনারসে গেলে দুটো ধর্মকেই কাছ থেকে অনুভব করতে পারবেন।’

ঘরে ঢোকার আগে জ্যাক জানতে চাইল, ‘কোথায় উঠেছেন?’

‘ঠিক পাশের স্যুটেই। ইচ্ছে হলে সকালে আমায় নক করতে পারেন’ মুজিবুর স্যুটে ঢুকে যায়।

রাত্তিরটা ভেবেচিন্তে জ্যাকের মনে হল আইডিয়াটা মন্দ নয়। সিকিমের বদলে বেনারসে গেলেই তো হয়। রাতারাতি সিদ্ধান্ত বদল। প্ল্যানের বদল স্ত্রীকে জানাতে ভুলে গেছিল। অতএব মুজিবুরের সঙ্গে বেনারস।

আলঘানিম চায়নি জ্যাক একাই ডিলটায় থাকুক। অক্সফোর্ডের বন্ধু যহলেও ডেভিডের আসল কমিটমেন্ট ওর দেশ। একবার জ্যাকের নোটবুকের হদিশ পেলে সারা দুনিয়ার যোগাযোগের সূত্র হাতের মুঠোয়। এজেন্সি যে কোনও সময়ে টাল খেতে পারে। তার ওপর নির্ভর করার থেকে নিজের প্ল্যান কাজে লাগানোই ভালো।

গন্ধকূট বিহার!

পাশেই বিখ্যাত বোধিবৃক্ষ যার নিচে বসে বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

মুজিবুর জ্যাককে বলল, ‘এটা মোটেই সেই গাছ নয় যার নিচে বসে বুদ্ধদেব জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ওটা বুদ্ধগয়ায়। আসল গাছটা বহুদিন আগেই মরে গেছে। শান্তির প্রতীক বলে সম্রাট অশোকের ছেলে মহেন্দ্র ওর একটা ডাল কেটে শ্রীলঙ্কায় বোন সংঘমিত্রাকে পাঠিয়েছিল। এটা শ্রীলঙ্কা থেকে আনা সেই গাছেরই ডাল। সারা দুনিয়ার বৌদ্ধরা এটাকেই আসল গাছ ভেবেই সম্মান করে।’

বেনারস থেকে সারনাথ ১০ কিমি। বোধহয় ওর সিদ্ধান্তই ঠিক। যদি কেউ বৌদ্ধদের মানসিকতা না বোঝে সে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্যও বুঝবে না। বিশাল বটগাছটাকে ঘিরে অনেকগুলো মন্দির আর স্তুপ। এগুলোর বেশিরভাগই শ্রীলঙ্কার লোকেদের বানিয়ে দেওয়া। বিশ্বের নানা দেশের ধার্মিক মানুষরা বহু মনাস্টেরি বানিয়েছে। সারনাথের বুকে এ যেন গোটা পৃথিবীর গাঁথা মালা।

জ্যাক মুজিবুরের দিকে ফিরল, 'আপনি কী বৌদ্ধ?'

হাসল মুজিবুর, 'না, আমি মুসলিম। আমার মতে সব ধর্ম একই কথা বলে। মানবতার জয়গান।'

জ্যাকের কথাটা মনে লাগে। নানা ধর্ম বিষয়ে এরকম জ্ঞানী পাওয়া যায় না। মুজিবুর ছেলেটাকে বাজিয়ে দেখতে হচ্ছে।

জ্যাক যখন স্তূপগুলো ঘুরে দেখছে মুজিবুর তখন আলঘানিমকে ধরল, 'এই লোকটাকে কোনও কাজে পাঠিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কিছু গোলমাল?'

'ঠিক বুঝছি না। কার হয়ে কাজ করছে ঠিক বুঝলাম না। সিকিম যাচ্ছিল কেন?'

আলঘানিম ভাবছিল। ডেভিড ডালটনকে বলেছিল ভারত সরকারের উঁচু মহলে কাউকে ধরতে। মাথায় ঢুকছে না দিল্লিতে আসল লোকেদের সঙ্গে দেখা না করে জ্যাক সিকিমের পথে কেন? মন্ত ৎসে তুঙের অন্য কোনও কাজে নয়ত? যার বিষয়ে ওর জানা নেই। নাকি ডেভিড নিজেই অন্য গেম খেলছে? ডেভিড সেই অ্যামেরিকান যারা কমিউনিস্টদের হাটিয়ে ব্রিটিশদের পর বিশ্বে রাজ করছে। হয়ত কাজের লোক। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ডামাডোলের ওপর দখল রাখতে চাইবেই।

'নজর রাখো। কথা বার করতে হবে'

'ঠিক আছে স্যার। চেষ্টা করছি।'

মুজিবুর ফোন রাখল। এই ধাঁধাটে জ্যাক হ্যামিল্টনকে উল্টেপালটে খবর বার করা চাট্টিখানি কথা নয়।

***

অটপ্সির জন্যে সইসাবুদ করার সময় সুইশ কর্তারা জানতে চাইল, 'যদি চান নিশ্চয় অটপ্সি করব। বডিটা টুকরো টুকরো। সময় লাগবে। লাভ হবে?'

প্রমোদের ধারণা এই মৃত্যুর পেছনে কোনও গন্ডগোল আছে। সহজ অ্যাক্সিডেন্ট নয়। 'আমি চাই। বাবা যে হোটেলে উঠেছিল সেখানেও যাব।'

'ওখানে তদন্ত করেছি। মালপত্রও নিয়ে আসা হয়েছে।'

'কোন হোটেল?'

'লুসার্নের পাড়ে কাস্তানিয়েবাম সুইশ কোয়ালিটি সি হোটেল।'

'ইমশানাল টান। বাবা তো...'

একজন সিবিআই অফিসার বলে উঠল, 'দরকার হলে বলবেন। আমরাও যাব।'

'ধন্যবাদ। এলেনা আছে। আমরাই চলে যাব।'

'যা ভালো বোঝেন।'

মনে হাজারো প্রশ্ন জট বেঁধে। একা ম্যানেজ করা যাবে কি না সন্দেহ। বাবার সুইশ ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টটাও চেক করা দরকার। এলেনা ছাড়া আর কাউকে নাক গলাতে দিতে চায় না।

চেক-ইনের ডিটেল ছাড়া হোটেল থেকে কিছু পাওয়া গেল না। যখন চলে আসছে একজন বেলবয় এগিয়ে এল, 'আরও কিছু জানি। পে করতে হবে।'

একশো সুইশ ফ্রাঁর পাত্তি এগিয়ে দিল, 'সত্যিটা বল।'

'ভারতীয় ওই লোকটা এক সেক্সি লেডিকে নিয়ে এসেছিলেন।'

'ভারতীয়?'

'হ্যাঁ। হেভি অ্যাট্রাকটিভ। দুজনে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফেরে বেশ রাতে। মহিলা একাই নিজের ঘরে চলে যায়। লোকটি একটা ক্যাব নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরল এক ঘন্টা পর। ব্রেকফাস্টের সময় লেডি রোটায়ার স্টেশনে যেতে কতক্ষণ লাগবে জানতে চেয়েছিল।'

‘আর কিছু?’
‘আমার শিফট শেষ। আর কিছু দেখিনি।’

ফেরার সময় এলেনা জানতে চাইল, ‘মাউন্ট টিটলিসে যাবে?’

‘লাভ নেই। অ্যাক্সিডেন্ট বললে মন থেকে মার্ডারের সম্ভাবনাটা ওড়াতে পারছি না। রেল যদি খারাপই হয় নিশ্চয় সারানোও হয়েছিল। বাবার সঙ্গে কোনও মহিলার থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। মহিলা সঙ্গে মহিলা থাকলে বিদেশের রিমোট লোকেশনে যাওয়াই স্বাভাবিক।’

‘একলা বেরিয়ে কার সঙ্গে দেখা করেছিল?’

‘সেটাই আসল। কাজের লোক। অযথা সঙ্গিনী ছেড়ে একা ওই রাতে একা ঘুরতে যাওয়ার কথা নয়। এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। জুরিখ চলো। সুইশ ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে যদি কিছু হদিস পাওয়া যায়।’

‘নম্বর আছে?’

‘অবশ্যই। ড্যাড আগেই দিয়ে রেখেছিল। যদি কিছু হয়ে যায় পরিবার যাতে বঞ্চিত না হয়। ভিআইপি, শত্রু থাকারই কথা। দেশে সব সময় বডিগার্ড নিয়ে ঘুরত। জেড প্লাস ক্যাটেগরি। বাইরে সে প্রোটেকশন থাকত না।’

ট্রেনে ছবির মতো সুইশ উপত্যাকার মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটছে। এলেনার সে দিকেই নজর। সুইশ পর্বতমালা, অখণ্ড সবুজের সমারহর দিকে তাকিয়ে নিজের চিন্তায়। তার ভূমিকা নির্বাক দর্শকের। প্রমোদ না চাইলে মতামত দেওয়ার প্রশ্ন নেই। টাকা, ক্ষমতা, পুরুষ কোনোতেই আগ্রহ নেই। ইন্ট্রভার্ট। কারও পক্ষ নিয়ে বলার লোক নয়। বিনোদের শত্রুরা সম্ভবত এই সুযোগ পেয়ে কাজে লাগিয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে খুনিকে খুঁজে বার করা কঠিন।

মুখ ফেরাল এলেনা, ‘ব্যক্তিগত শত্রুর কাজও হতে পারে। তুমি কী করে নিশ্চিত হচ্ছ?’

‘জানি না। রাজনীতি থেকেও হতে পারে। ওর রাজনৈতিক দুনিয়া সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তোমার কী মনে হয়? দুর্ঘটনা?’

‘বেলবয়টা যা বলল তাতে তো মনে হয় না। কারও সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। হতেই পারে ওর সঙ্গে কোনও ডিলে হয়েছিল। সঙ্গী মহিলাকে জানাতে চায়নি। সেই রাতে ঠিক কী কী হয়েছিল জানতে পারলে মৃত্যুর কারণ জানা যেতে পারে’ বাইরের তাকাল। প্রান্তর ছেড়ে ট্রেন দুটো টিলার মধ্যবর্তী ছোট্ট একটি স্টেশনে ঢুকছে।

সে পাঞ্চেতের শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে, ‘যখনই মাথা গুলিয়ে যাবে চোখ বুজে ধ্যান করো। ঠিক উত্তর পেয়ে যাবে।’

জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হোলডার হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রমোদ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক লেনদেনের প্রিন্টআউট নিলো। এলেনা বুঝতে পারছে ভারতের যা-ই অবস্থা হোক না কেন অ্যাকাউন্টের ছবির সঙ্গে কোনও সামঞ্জস্য নেই। বিনোদেরই যদি এত টাকা, অন্য রাজনৈতিক নেতাদের কী পরিমাণ থাকতে পারে! ভেবেই মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিরাট ঐতিহ্যের পাশাপাশি ভারতের এক শ্রেণির অর্থের কমতি নেই।

হঠাৎ প্রমোদ বলে উঠল, ‘এই একটা ট্র্যানজাকশন, মৃত্যুর কদিন আগে’

এলেনা প্রিন্টআউটটার দিকে তাকাল। ৫০০ মিলিয়ান সুইশ ফ্রাঁ। বিনোদের অ্যাকাউন্টে বিরাট অঙ্কের টাকা! সম্ভবত কোনও গোপন ডিলের। কোত্থেকে, কেন? কেবল একটা নাম। ওটা যে ভুয়ো আন্দাজ করা কঠিন নয়। ট্র্যান্সফার ডয়েশ ব্যাঙ্ক থেকে। নিশ্চয়ই বিদেশের কোনও ডিল থেকে। এর মধ্যেই কী মৃত্যুর কারণ নিহিত?

প্রমোদ ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা ব্রিফকেসে নিয়ে বেরিয়ে এল। এবার প্রয়োজন পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। পেলেই বাবার জিনিসপত্র নিয়ে ফেরার পালা।

ওদের দেখেই সিবিআই অফিসারটি একটা কাগজ এগিয়ে দিল, 'অটপ্সি রিপোর্ট। ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু। পেটে প্রচুর অ্যালকোহল পাওয়া গেছে।'

প্রমোদ হাসল, 'ঠান্ডার দেশে এটাই স্বাভাবিক। আমরা তাহলে ফিরব। বাবার অনুগামীরা উদগ্রীব অপেক্ষায়।'

প্রমোদ সহ বাকিদের যেটা নজর এড়িয়ে গেল পেপারের তলায় এক গোছা সুইশ ফ্রাঁ। সিবিআই অফিসার যখন ব্রিফকেসে রিপোর্টটা ঢোকাচ্ছে, এলেনার চোখ এড়াল না।

***

লাজবন্তী সেন অমৃতার কাছ থেকে আত্রেয়ী সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারেনি। কদিন অপেক্ষা করে ঠিক করল ফোনে খবর নেবে। ইতিমধ্যে দ্বৈপায়নের নোটবুক ঘেঁটেছে। বিচিত্র কিছু চ্যাট। সিদ্ধান্তে আসার আগে অমৃতার সঙ্গে কথা বলা জরুরি।

'কোনও খবর নেই? সব ওকে?' হটলাইনে জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ। এখনো কাজ করে যাচ্ছি। আত্রেয়ী ওর বাঙালি প্রেমিকের সঙ্গে ছুটি কাটাতে বালির এক ভীষণ দামি ভিলায় গেছিল। একজন আইএফএসের মাইনেতে এই লাক্সারি অসম্ভব। খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি কার খরচে।'

'কিছু পেলে?'

'না। এই উড়নচণ্ডে জীবনযাত্রার টাকা কোত্থেকে খুঁজতে লোক লাগিয়েছি।'

'দ্বৈপায়ন নামের একজনের একটা নোটবুক পেয়েছি। সেও খুন হয়েছে। সম্ভবত ওই ওর বাঙালি প্রেমিক। মধ্যবিত্ত পরিবারের।'

'কোনও বড়লোক টাকা ঢালত। কে সে? কেনই বা? এখানের ম্যাক্সমুলার ভবনের গ্যেটে ইনস্টিটিউটে মেয়েটা জার্মান শিখত। খোঁজ চলছে এসব সূত্রে বিশেষ কারও সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না। কিছু পেলেই জানাব। বাঙালি ছেলেটা খুন হল কীভাবে?'

'এখানকার একটা হোটেলে, গুলিতে।'

'যদি ওর প্রেমিক হয় খুঁজে বার করা মুশকিল। দুজনেই এখন মৃত।'

'তবুও... চেষ্টা চালাচ্ছি ওর নোটবুকটা নিয়ে।'

'কিছু পেলে জানিও।' অমৃতা ছাড়ল।

সারাদিন দৌড়োদৌড়ির পর অবশেষে লাজবন্তী দ্বৈপায়নের নোটবুক নিয়ে। এটাই একমাত্র উপায় যেখান থেকে ছেলেটার জীবন সম্বন্ধে জানা যেতে পারে। অনিমেষ দাসকে ফোন করল, 'কী করে বুঝলেন দ্বৈপায়ন আর দীপাঞ্জন একই লোক?'

'ওর ফোটো দেখে আমার সোর্স বলেছে। নোটবুকটা ঘাঁটাঘাঁটি করিনি, কারণ আমি কম্পিউটারে অভ্যস্ত নই। কোনও ক্লু মিস করে থাকতেই পারি। স্কাইপ অ্যাকাউন্টে ওর নাম দীপাঞ্জন।'

মেল, চ্যাট রেকর্ড চেক করে বুঝল অনিমেষ ভুল বলেনি। অধিকাংশ মেলই ছেলেটার অ্যাকাডেমিক বিষয়। আত্রেয়ীর সঙ্গে কয়েকটা রোম্যান্টিক চ্যাট। ওগুলো থেকে স্পষ্ট ওদের প্রেমের কথা। অমৃতাই ঠিক। যথেষ্টই ঘনিষ্ঠতা। আরেক জন এলেনা চৌধুরী যে কে, তার ডিটেলস নেই। ওকে নিজের অ্যাকাডেমিক কাজকর্মের খবর দিত। তার মতামতকেও যথেষ্ট গুরুত্বও দিত। কিন্তু এর বেশি আর কিছু নয়।

লাজবন্তী স্কাইপে ওর বেনামি অ্যাকাউন্টটা নিয়ে পড়ল। ওখানে অধিকাংশ চ্যাটই জিয়া নামে কারও সঙ্গে। প্রোফাইলে ছবি বা অন্য ডিটেলস নেই। কেবল অ্যাকাউন্ট যে এক মহিলার, শুধুএটুকুই। প্রথম দিকের

চ্যাটগুলো ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ নিয়ে। মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের যেমন হয়। পরে যৌনতার দিকে মোড় নিয়েছে।

'শুধুই কী বন্ধু হিসেবেই যোগাযোগ রাখতে চাও, নাকি বিছানায়ও?' জিয়া জানতে চেয়েছে।

'আমি হ্যান্ডসাম। জানি না তোমায় কেমন দেখতে। যদি আকর্ষণীয় মনে হয়, কেন নয়?'

'কীসে তোমার উত্তেজনা হয়?'

'চোখে পড়ার মতো মুখ, শরীরের গঠন, সেক্স অ্যাপিল।'

'রোগা না মোটা?'

'খুব স্লিমও নয় আবার খুব মোটাও নয়। স্বাস্থ্যবতী।'

'যদি বলি মাঝামাঝি'

'ছবি পাঠাও। দেখলে সুবিধে হয়।'

'ছবির কথা ভুলে যাও। নিজের বলে তো অন্য কারও ছবিও পাঠাতে পারি। ধরবে কী করে? আমি তো তোমার ছবি চাইনি।'

'ঠিক। এসব ভারচুয়াল ছবি দিয়ে হয় না।'

'কেমন সেক্স পছন্দ?' জিয়ার প্রশ্ন।

'ভাবিনি। সেক্স করার সুযোগ আগে হয়নি।'

'কেন, গার্লফ্রেন্ড নেই?'

'আছে। বিয়ের আগে ওর এসব পছন্দ নয়। আমারও তো চাহিদা আছে'

'ধরো, যদি আমি সে চাহিদা পূরণ করি...' জিয়া বলেছে।

'হস্তমৈথুনের চেয়ে ভালো। গোঁড়া একজনের প্রেমে পড়েছি যে।'

'তোমার চাওয়াটাও পূরণ করার তো প্রয়োজন। ওসব পুরনো ভাবনা ছাড়ো।'

দীপাঞ্জন একটু থেমেছে, 'দেখি, কী হয়।'

'তোমার অবস্থা বুঝতে পারছি। আমি তোমার পক্ষে। কোথায় থাকো?'

'কলকাতায়।'

'আমিই না হয় সে চাহিদা পূরণ করে দেব। কেবল দেখো জায়গাটা যাতে খুব পরিচিত না হয়। তুমিও নিশ্চয় চাও না জানাজানি হোক।'

'পাগল, কেউ চায়। তোমায় চিনব কী করে?'

'আমার নম্বর টেক্সট করে দিচ্ছি। তোমারটাও দাও। মোবাইলে রেখে দিও।'

দীপাঞ্জন সেভ করেছে নিশ্চয়ই।

'এবার থেকে মোবাইলে কথা হবে, স্কাইপে নয়। দেখা হওয়ার আগেই আমার গলা চিনে ফেলেছ। জীবনের সেরা অরগ্যাজম তোমায় দেব।' জিয়া টাইপ করেছে।

চ্যাট হিস্ট্রিতে আর কিছু নেই। লাজবন্তীকে ওর ফোন থেকেই বাকিটা ট্র্যাক করতে হবে। অনিমেষকে ফোনে, 'আপনার কাছে ওর মোবাইল নম্বর আছে?'

'না। তবে ওর বোনের কাছ থেকে পেয়ে যাব।'

আগ্রহের সঙ্গে ফোনের অপেক্ষায় রইল। অনিমেষ যা বলল তাতে একটু ধাক্কাই খেল। দ্বৈপায়নের মোবাইল নম্বর জিয়াকে দেওয়া নম্বরের সঙ্গে মিলছে না। যেহেতু বেনামি, দ্বৈপায়ন নিশ্চয় বুদ্ধি করে সেফ খেলার জন্যেই জিয়াকে কোনও প্রি-পেড নম্বর দিয়েছে। ও-ই কি তাহলে দ্বৈপায়নকে খুন করেছে? অনিমেষের খবর কী ঠিক?

ওয়াটসনকে শার্লক হোমস যা-ই বলুক তদন্ত ততো সহজ নয়।

***

ব্রেকফাস্ট করার সময় এলেনা টিভিটা চালিয়েছে। সব চ্যানেলে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে, ঠিক মাঝখানে আট রিখটার স্কেলেরও বেশি ভূমিকম্পে বিশাল সুনামির খবরের বন্যা। জাপানের পুরো পূর্ব উপকূল বিধ্বস্ত। গোটা দুনিয়া কাঁপছে। ব্যাপক প্রভাব পড়েছে অ্যামেরিকার পশ্চিম উপকূলে, প্রধানত সান ফ্রান্সিস্কো, সান জোসে অঞ্চলে। বহু লোক মারা গেছে। মনে পড়ল ২০০৪-এর সুনামির কথা যা জাপান, আন্দামান আর নিকোবরে আছড়ে পড়েছিল। ওটা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে। এবারের সুনামির এপিসেন্টার সমুদ্রের গভীরে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। অস্বস্তি লাগছে। যখনই মানবতা আঘাত পায় এলেনার কষ্ট হয়। পাঞ্চেত জোংপা তার মধ্যে মনুষ্যজাতির জন্য করুণার মন্ত্র উদবুদ্ধ করেছে।

তার হামবুর্গ ম্যানসনে বসে রেইনার প্রাণ খুলে হাসল। জাব্রিয়ার বাড়িতে আলঘানিমও। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অ্যামেরিকার জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলায়। ইতিহাস ফেরৎ দিচ্ছে। পার্ল হার্বারে যদি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ না হত, আজও থার্ড রাইখই ক্ষমতায় থাকত। এই মহাবিপর্যয় যেভাবে ওর মনোবাসনাকে চরিতার্থ করছে আলঘানিম উপভোগ করছে।

এই বিপর্যয়ে ডেভিড ডালটন সকালের ফ্লাইটেই সোজা সেনেটর এডোয়ার্ডসের কাছে। ওকে নিজের পরিকল্পনায় প্রায় রাজি করিয়ে এনেছিল। এর মধ্যেই এই বিপর্যয় সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক স্থিতি এলোমেলো করে দিয়েছে। সেনেটর যদি এখন ছাঁকা প্ল্যান দিয়ে অর্থনীতিকে ঘুরিয়ে দাঁড় করার উপায় না বাৎলান, তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনারও সম্ভবত ইতি। জাপান অর্থনৈতিক প্রধান শক্তি হিসাবে উঠে আসছিল। এতবড় বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলাতে অনেক সময় লেগে যাবে। জাপানের কী হল সেটা বড় নয়। আসল তার মাতৃভূমি। একে অর্থনীতি তলানিতে। এরপর আরও অর্থনৈতিক সর্বনাশ বাড়িয়ে দেবে।

সেনেটর গজরাচ্ছে। আতঙ্কে প্রাণ উড়ে যাওয়ার জোগাড়। ডেভিডকে জিগেস করল, 'ডাও জোনস ক্র্যাশ করছে। এই বিপদ থেকে বেরোনোর উপায়?'

ডেভিড মাথা নাড়ল, 'স্বাভাবিক সময়ের মতো এ আবস্থায় কিছুই কাজ করবে না। এক মাত্র পথ যুদ্ধ। অস্ত্র বেচতে পারলেই অর্থনীতিকে ফেরান সম্ভব।'

'অত সহজ নয়।' এডোয়ার্ডস জবাব দিল।

'ঠিক। তাহলে অন্য কী পথ?'

'তোমার এজেন্ট জ্যাক হ্যামিল্টনের কী হল?'

'বেনারসে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে।'

'আর কাউকে এ প্ল্যানে রেখেছি? সেনেটর হিসেবে তো সরাসরি কিছু করতে পারব না।'

'একটু ভাবতে দাও। মাথায় কিছু এলেই জানাচ্ছি।'

***

এতকিছু এলেনা জানত না। মাথায় কেবল এই বিপর্যয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের কথাই।

পাঞ্চেতকে ফোন করল, 'সুনামির খবর পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, রেডিওয় শুনলাম।'

'মন খারাপ। কত মানুষ মারা গেছে।'

পাঞ্চেত সকালের ধ্যানের পরে রেডিও শোনে। ওকে সান্ত্বনা দিতে বলল, 'তোমার কথা শুনে ভালো লাগল। এ তো হওয়ারই ছিল।'

'মানে?' এলেনা হকচকিয়ে গেল।

'প্রকৃতির নিজস্ব একটা নিয়ম আছে। ইতিহাসেরও। পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য গতিশীল সুস্থিত অবস্থায় থাকে। যখনই তা এলোমেলো হয়ে যায় তখনই প্রকৃতি নিজ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে। দুনিয়ার পুঁজির তো সীমা আছে। চাহিদা বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে, হয় পুঁজি বাড়াতে হবে নইলে

চাহিদায় রাশ টানতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ বাড়াবার উপায় নেই। ভারসাম্য আনতে চাহিদা কমানোই আবশ্যক। কিছু পদ্ধতিতেই যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারিতেই এ সম্ভব।। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'

এলেনা অবাক। পাঞ্চেত সুদূর মনাস্টারিতে বসে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মূল তত্ত্ব আয়ত্ত করেছে। ও তো রক্ষাকর্তা বা মেসায়া নয়। বুঝেছে কেবল মাতৃ প্রকৃতির সংস্পর্শে। কথা শুনে মন অনেক শান্ত। প্রয়াত মানুষগুলোর জন্যে মন কাঁদছে। যেসব দেশের মানুষরা কষ্ট পাচ্ছে তাদের পাশে। মনের মধ্যের তোলপাড় পাঞ্চেতের কথাগুলো তাকে শান্ত করে নিরসন করছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে কাজে বেরোবার জন্যে চটপট লাঞ্চ গোছাতে ব্যস্ত।

***

চেষ্টা করেও রাইয়ের খুনের কেসটায় সুবিমল ব্যানার্জি এগোতে পারছিছে না। হাতে তথ্য কেবল মেয়েটা মারা গেছে জনৈক রহস্যময় দেবাংশ ভার্মার ভাড়া করা ফ্ল্যাটে। ওর কাছের মানুষজনের সঙ্গে দেখা করেও তেমন সাহায্য হয়নি। কাছে মেয়েটার ফোটো আর পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। ভাবছে গোপন সোর্সদের ফোটোটা দিয়ে যদি লাভ হয়...। এস্কর্ট এজেন্সিগুলোতেও ছানবিন করল। কোথাও ওর নাম নেই।লন্ডন পাব, তন্ত্র, ইনকগ্নিটোর মতো নাইটক্লাব গুলোতে খোঁজ নিল। কেউ দেখেছে বলতে পারল না। তার মানে ওখানে নিয়মিত নয়। এসব নাইটক্লাব বা এস্কর্ট সার্ভিস ছাড়া খদ্দের পেত কীভাবে? বাড়তি টাকা কোত্থেকে আসত? কলকাতায় অন্য পরিচয়ে? প্রশ্নগুলো তুলে লাজবন্তীকে রিপোর্ট পাঠাল।

লাজবন্তী ভাবছিল দেবাংশ ভার্মা সম্পর্কে জানতে অমৃতাকে চাপ দেবে কি না। নিজের কাজের ওপর এটা বাড়তি বোঝা। নিশ্চয় রিয়া কলকাতায় কোনও নির্দিষ্ট পরিচয়ে পরিচিত। মাথা খাটাতে হবে। বরং কলকাতার পরিচিত মহলে খোঁজ নেওয়া যাক। ফরেনসিক বলেছে কুমারী নয়। তাহলে এই বিলাসী জীবনযাপনের খরচ কে বা কাড়া জোগাত? বারবার রিপোর্টটা পড়ল। নাঃ, কোনও কিছুই মাথায় আসছে না। ও তো মিনতি ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ। মিনতি বলেছে এক সময় অ্যালবার্ট চৌধুরীর বাড়িতে কাজ করত। এখানে নাম নেই, তার মেয়েই পড়াশোনায় সাহায্য করেছিল। কে সে? তাকে খুঁজে বার করা গেলে হয়ত সেখান থেকে যোগসূত্র মিলতেও পারে।

পরদিন সকালে অমৃতার ফোন, 'খবর আছে'

'বলো।'

'শেষমেশ যোগসূত্র বেরল। আত্রেয়ী তার জার্মান শিক্ষক হান্স গ্রুবারের ঘনিষ্ঠ। সম্ভবত জার্মানির কেউ এরকম জীবনযাপনের খরচা যোগাত।'

'হঠাত কেন?'

'অকারণে এত দামি ট্রিপের খরচ দেবে না। পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনও অভিসন্ধি। সম্ভবত কলকাতায় গেছিল প্রেমিকের সঙ্গে ঝামেলা মেটাতে।'

'যে ছেলেটা গুলি খেয়ে মারা গেছে সে ওর বয়ফ্রেন্ড নাও হতে পারে।'

'হঠাত মত পরিবর্তন?'

'সন্দেহজনক মোবাইল। লিঙ্ক পাচ্ছি না।'

'ছেলেটি কোথায়?'

'বার করার চেষ্টা করছি।'

অমৃতা যদি ঠিক হয় বিষয়টা সিরিয়াস। একজন জার্মান কেন, হান্স গ্রুবারের মারফৎ ওকে স্পন্সর করতে যাবে? গুলি করা হয়েছে সুইশ মিনি বন্দুক দিয়ে যা ভারতে পাওয়া যায় না। সুইশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যায় না। সম্ভবত আত্রেয়ীর কোনও বিদেশি যোগাযোগ ছিল। একা এই কেসে না থেকে বরং

রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং (র) কে দেওয়াই ভালো। মেয়েটার মৃত্যুর সঙ্গে হয়ত এমন কোনও বিদেশি জড়িত। লাজবন্তীর পেশাগত আয়ত্বের বাইরে।

পশ্চিম অপেক্ষায় ভারতের অর্থনীতি অনেকটা ভালো। বিশ্ব বাজারে প্রবেশ। অন্য দেশগুলোকে ভারতে প্রবেশে উৎসাহি করতে পারে।

বিশ্ব শক্তি এখন পরিবর্তনের মধ্যে।

***

এক বছর আগের কথা।

মিশরের কারনাক মন্দিরের কাছে লাক্সরে অনেক লোকের জমায়েত। মন্দির ঘিরে সন-এত-লুমেয়েরে বিশ্বের নানান জায়গা থেকে বিশেষ অতিথিদের আমন্ত্রণ। সাধারণত এই শোটা সকলের জন্যে। কেবল সেদিনই এই বিশেষ অতিথিদের জন্যেই সংরক্ষিত।

মন্দিরের কাছেই হ্রদের পাশে সবাই বসে। আলো নিভতেই সবদিক অন্ধকার। শুধু মন্দিরের এক অংশই আলোকিত। গভীর বার্টনিয়ান গলায় ধারাবিবরণী হচ্ছে। আলোর খেলা মন্দির ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে। ধারাবিবরণীর সঙ্গে বাজনা। শো শেষে অতিথিদের লাক্সারি ইয়টে ককটেল ডিনার, আমোদ-প্রমোদ।

ব্যবস্থা হয়েছে সুস্বাদু মিশরীয় খাওয়ারের। মধ্য প্রাচ্যের সবথেকে ভালো মানের রুটি, ফালাফেল, ভেড়ার মাংস, মুর্গি, কোনও কিছুরই কমতি নেই। অর্কেস্ট্রার মূর্ছনার সঙ্গে লাস্যময়ী নারীর নৃত্য।

ক্রুজারের যাত্রা শুরু লাক্সর থেকে। সূর্য অস্ত গেছে থেবীয় কবরস্থানে। নদীর জলের ঝিকমিকি ইতিহাসের সাক্ষ্য।

নীল নদের বুকে হাঁসের মতো উচ্ছ্বল গতিতে ক্রুজ করা ইয়াটে ক্লডিও আলবের্তো, আত্রেয়ীর পাশে ডেক চেয়ারে বাসটেট। মহিলা ও পুরুষ অতিথিদের মন ভরান লাস্যময়ী গায়িকার সুরলহরী অন্তরীক্ষে ভেসে যাচ্ছে। নানা কোণ থেকে উজ্জ্বল আলোর চমক ঝলসে দিচ্ছে লাস্যময়ী গায়িকার দেহবল্লরী। আসন গ্রহণ করার সময়েই পরিচয় সারা। আল নুর পারফিউম কোম্পানির মালকিন স্বাস্থ্যবতী ভরাট স্তন বাস্টেটের বয়স চল্লিশের গোড়ার দিকে। লো-কাট ঝকঝকে কালো পোশাকে স্তনযুগল প্রকট যেন মুক্তির অপেক্ষায়। বাবা আল নূরের পর সে-ই কোম্পানির সর্বেসর্বা।

ভারতে পারফিউম যত প্রাচীনই হোক, প্রধানত গন্ধ ভিত্তিক। ইতার-এর প্রাচীনতম উল্লেখ মেলে চরক সংহিতায়। বিশ্বের প্রাচীনতম পারফিউম পিরগস প্রথম সাইপ্রাসে পাওয়া যায়। মেসোপোটেমিয়ান সাম্রাজ্যের অংশ মিশর শীঘ্রই খ্যাত হয়ে ওঠে পারফিউমের জন্যে। হামিদ–আল-বুখারি তার সুন্নি ইসলামের আল-কুতুব আল-সিতা-তে বলে পয়গম্বর মহম্মদ বলেছে, ‘প্রত্যেক তারুণ্যে পৌঁছনো মুসলমান পুরুষকে শুক্রবার স্নান করতে হবে। মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজতে হবে। আর যদি পাওয়া যায় পারফিউম ব্যবহার করতে হবে।’ মহম্মদের কথা অনুসরণ করেই আল নুর পারফিউম এক্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করে। সুগন্ধী বস্তু দিয়ে সুরক্ষিত করার ধারণা কাজে লাগিয়েই পারফিউমের উদ্ভব। পরে মেকআপ হিসাবে নখে হাতে হেনার ব্যবহার। গুঁড়ো ম্যালাকাইট থেকে পাওয়া কালো কোহল থেকে শুরু চোখকে স্পষ্ট সুন্দর করা। গুঁড়ো ম্যালাকাইট থেকেই তৈরি আই শ্যাডো। গেরি মাটির ব্যবহার ঠোঁট রঙ করাতে। এসবে জন্তুর চর্বি ব্যবহার হত যাতে ঘনভাবে সংরক্ষণ করা ব্যবহৃত হত না, চোখকে ধুলোবালি, ময়লা থেকেও রক্ষা করতে।

মিশরের পারফিউম শিল্পের এই উন্নত প্রাচীন ঐতিহ্য থেকেই আল নূর আন্দাজ করে পারফিউম রপ্তানির মুনাফা। মিশরের নিরিখে বিরাট লাভ। তখন পশ্চিমে, প্রধানত ফ্রান্সেই রপ্তানি করত। ফরাসিরা কিছু রদবদল করে প্রায় ৪০০ গুণ দাম বাড়িয়ে বাজারে বেচত। মিশর পশ্চিমের মতো ধনী দেশ নয়। বুঝতে পেরে বাস্টেট ওদের সঙ্গে দাম নিয়ে দরাদরি শুরু করে। এত লাভজনক ব্যবসার ভাগ দিতে চায়নি ফরাসিরা। ওপর ওপর কথা চালালেও মূল ব্যবসায়িক লেনদেনে পরিবর্তন করতে নারাজ।

অর্থনীতিতে ধ্বসের পরে রেইনার স্মেলঝাইসেন আর মার্ক হেনলি ইইসির হয়ে ইয়োরোপের শক্তিকে পুরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নেয়। ইইসির অন্যান্য দেশগুলকেও একই ছাতার তলায় নিতে আহ্বান জানায়। হতে পারে ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্ক ভালো নয়। ইইসির ছত্রছায়ায় নিজেদের অর্থনীতিকে চাঙা করতে তারাও হাত মেলাতে দ্বিধা করে না। যদিও অন্য ব্যাপারে অ্যামেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব, এ ব্যাপারে ওদের ওপর নির্ভর করেনি।

বাস্টেট ক্লডিওকে জিগ্যেস করে, 'কোথা থেকে?'

'নো ইংলিশ। রিও ডি জানেইরো।' ক্লডিও দুটো হাত নাড়ে, 'কেবল পর্তুগিজ।'

আকর্ষণীয় এরকম কারও সঙ্গে কথা না বলে পুরো সন্ধে কাটানো অসম্ভব। একে কেন আমন্ত্রণ করা হয়েছে সেটাও জানা জরুরি। আত্রেয়ীর দিকে ফেরে, 'তুমি?'

'ভারত।'

'ব্যবসায়?'

'না, দিল্লিতে পড়ি।' শাড়িটা ঠিক করে গর্বের সঙ্গে বলে, 'আমার টিচার হান্স গ্রুবার এনেছে। দিল্লির গ্যেটে ইন্সটিটিউটে জার্মান শিখি। আমার ড্যাড স্টেটসে ইন্ডিয়ান এম্ব্যাসির সেকেন্ড ম্যান।'

পশ্চিমের সঙ্গে ব্যবসা চালানোর সূত্রেই বাস্টেট একটা গন্ডগোল আঁচ করছিল। এসেছে ইইসির সঙ্গে ভালো রফার ধান্দায়। বুঝতে পারছে না, ক্লডিও আত্রেয়ীরা এখানে কেন।ক্লডিও যদি ইংরেজি জানত, অন্তত এই বিশেষ ট্রিপের অঙ্কটা বুঝতে পারত। ইইসির আমন্ত্রণ। সেখানে ভারতীয় ছাত্রীটি কেন?

মাথা কাজ করে যাচ্ছে। নাঃ, আসল মতলব বোঝা যাচ্ছে না। সেটাই বার করা জরুরি।

***

ডাও জোনসের পতনের শেষ নেই। ডেভিড ডালটন ভীত। এই অবস্থা যদি না বদলায় আগামী প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে সেনেটর এডোয়ার্ডসের আশা তলানিতে। যেভাবেই হোক অ্যামেরিকাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে যে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারবে তার পাল্লাই ভারি।

সেনেটর ডেভিডের ক্যালিফর্নিয়ার র‍্যাঞ্চে। কফি নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডালটন, তোমার ইহুদি বুদ্ধির ওপর ভরসা করেছিলাম। একটা উপায় বাৎলাতে পারছ না?'

'অনেক ভেবেছি। যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনও উপায় আছে বলে মনে হচ্ছে না। আলঘানিমকেও তাতানো যাচ্ছে না। ইরান, ইরাক আফগানিস্তানই ভরসা। ভারতের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি র ওদের সঙ্গে সামঝতা করে নিয়েছে। যুদ্ধ বাধলে ভারত মধ্যেখানে এসে যাবে। আমাদের পক্ষে সেটা ভালো নয়। অন্য কিছু ভাবতে হবে।'

'কেন, পাকিস্তান তো আছে। সেখানে ভারত নাক গলাবে না।'

'ভারত নয় করল না। কিন্তু অন্যরা আমাদের বিরুদ্ধে ভেটো দেবে। সবাইকে চটিয়ে কী লাভ?'

'তাহলে বিকল্প?'

'দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে কথা বলা যাক। প্রাকৃতিক সম্পদের জন্যে এতকাল ওদের সাপ্লাই নিয়ে ব্যবসা করেছি। এখন আচমকা ওদের ঘাড়ে বন্দুক ঠেকানো মানে জিনিসের দাম বাড়া। কিন্তু তাতেও যে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলা যায় না।'

সেনেটর সন্ত্রস্ত। যেভাবেই হোক একটা ট্রাম্প কার্ড চাই। শাহেনসা রাজনীতির খেলোয়াড় ডেভিডের বুদ্ধি তুখড়। একে অক্সফোর্ডের প্রাক্তনী, তার ওপর ইহুদি। ওর থেকে আর কে ঠিক পরামর্শ দেবে?

ডেভিড বলল, 'ভারতে বিশ্বাসযোগ্য কাজের লোক পাঠানো যাক। দুঃখের বিষয়, এরকম বিশ্বাসযোগ্য যে একজন ছিল হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। ও এরকম করতে পারলে ভারতের সঙ্গে জুড়ে যেতাম। আমাদেরই দুর্ভাগ্য। ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট পোক্ত। কিছু করতে গেলে ওখানকার দুর্নীতির সুযোগ নিতে হবে।'

'তাহলে এবার?'

‘ওর জায়গায় আরেকজন বিশ্বাসযোগ্য কাউকে পাঠাতে হবে। আমার ওপর ছেড়ে দেও এডোয়ার্ডস। ক্যাম্পেনে নজর দাও।’

ডেভিডের পক্ষে ‘ক্যাম্পেনে নজর দাও’ বলাটা সহজ। বিষয়টা অত সহজ নয়। ক্যাম্পেনে বাস্তব ভিত্তি লাগে।

হাওয়ায় লড়াই চলে না। বাতাসের ওপর বাড়ি বানানো যায় না।

***

বিরাট বিস্ফোরণ!

পেরুর ইয়ানাকোচা খনি এলাকায়। যত না লোক মারা গেছে, তার থেকে বেশি জিনিসপত্রের ক্ষতি। প্রধানত সোনা রুপো। এটা চিলির ক্যান্ডেলারিয়া বা এল আব্রা, ব্রাজিলের ভিলা নোভা বা পেরুর লা ঝাঞ্জার মতো জনবহুল এলাকাতেও হতে পারত। ডেইজি কাটার ব্লাস্ট আচমকাই ইয়ানাকোচাকে নাড়িয়ে দিল। বিস্ফোরণের ওপর আগুন। ভূমিকম্পের মতো ছোট শহরটা এলোমেলো। প্রথমটা শুনে ক্লডিও ভেবেছিল ভূমিকম্পকেই বোধহয় ভুল করে বিস্ফোরণ বলে খবরে প্রকাশ। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করতে নড়েচড়ে বসল। যদিও ব্রিটিশরা গোড়ায় এর পরিকল্পনা করেছিল কিন্তু মনে হচ্ছে না এই পেরু ব্লাস্টের পেছনে তাদের হাত।

ল্যাটিন অ্যামেরিকানরা এতটা ভাবেনি। জায়গাটা সমৃদ্ধ অঞ্চল নয়। কলম্বিয়ার ড্রাগ মাফিয়াদের সাম্রাজ্যের কাছাকাছিও নয়। বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে নগণ্যই। বিস্ফোরণেই জনসমক্ষে। গোটা দুনিয়া অবাক। এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ইয়ানাকোচা কেন? ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল মিসাইল গাইডেড ব্লাস্টের উৎস খুঁজতে। সিআইএ, এম ফিফটিন, র প্রত্যেকের নজর দেশটায়। কোনও দলই দায়িত্ব স্বীকার করল না।

বাকিদের মতো এলেনাও যখন খবরটা জানল, তার কাছেও অদ্ভুত লাগল। এটা যদি মায়া বা মেক্সিকোর কোথাও হত, মানে ছিল। দক্ষিণ মায়া অঞ্চল ৬০০ খ্রি থেকে খনিজ ধাতুর কেন্দ্রভূমি। মিচোয়াকান তখন প্রযুক্তিতে প্রবল উন্নত। আদিম ধাতুশিল্পের উৎস এই মেক্সিকো। মেক্সিকোকে কেন্দ্র করেই ধাতুশিল্পের বিস্তার।

বাইরের দুনিয়াতে যারা লোহা, তামা, সোনা, রূপো আর মলিবডেনাম দিয়ে তৈরি জিনিসের কাঁচা মাল সাপ্লাই করে ক্লডিও অ্যালবার্তো তাদের অন্যতম। যদিও আসল ব্যবসা মেক্সিকোতে, চোখ জুড়োনো সমুদ্রতীরে দৈহিক রূপলাবণ্যে সমৃদ্ধ ল্যাটিন মেয়েদের জন্যেই রায়ো-ডি-জানেইরো বেশি পছন্দ। পুয়েরটো রিকোতেও আকর্ষক মেয়ে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দক্ষিণ ব্রাজিলের মতো চোখ জুড়োনো সাগরতট কোথায়? এখানকার কেপ ক্যাপ্রিকর্নের সমুদ্রতটে লাস্যময়ী শ্যামলা কেশি যুবতীদের বিচরণ। অর্থবান, নারী আসক্ত ক্লডিও সৌন্দর্যের পূজারি। প্রকৃতি বা ট্যানড মহিলার কোনও কমতি নেই।

বিকেলে গ্যাব্রিয়েলাকে নিয়ে রিওর ইপানেমা বিচে গা এলিয়ে ক্লডিও। অন্যান্য ব্রাজিলের মেয়েদের মতো কাঙ্গা পরা গ্যাব্রিয়েলা ক্লডিওর সঙ্গে চাঁদনি সন্ধ্যায় কাচাকায় চুমুক দিচ্ছে। আখের রস থেকে তৈরি মদে দুজনেরই আসক্তি। সাগরবেলার পশ্চিমতীরে পোসটোস দোইস ইরমাওস পাহাড়কে দু ভাগে ভাগ করেছে। মাঝখানে কতকগুলি লাইফগার্ড টাওয়ার। গ্যাব্রিয়েলা ঘ্যানঘ্যান করছে কখন উঠে লেব্লনের দিকে পস্তো টেন এলাকায় গিয়ে ক্যারিওকার লোকেদের সঙ্গে মিশবে।

ক্লডিওর ভিলা ক্লডিও মারসিয়ায় রাতে আনন্দ-ফুর্তি-সহবাসের প্রতীক্ষায়। তেমন মেয়ের সঙ্গ পেলে ক্লডিও বিছানায় রাজা। গ্যাব্রিয়েলা তো কম লোকের সঙ্গে শোয়নি। ক্লডিওর জুড়ি নেই। কখন ভিলায় যাবে সেই অপেক্ষায়। গা থেকে বালি ঝেড়ে ক্লডিও উঠে বলল, ‘চল, যাওয়া যাক।’

গ্যাব্রিয়েলাও অপেক্ষায় কখন কাঙ্গাটা খুলে নগ্ন অবস্থায় চাঁদনি রাতে দুজনে ডিনারে বসবে। সহবাসের আগে এভাবে নিজেকে জাগিয়ে তোলা ক্লডিওর সাধের কল্পনা। ভিলার লনে ব্রাজিলের কাইপিরিনহা আর

রিসোলের স্বাদ নিতে টের পেল তার মোটা ঠোঁট, উন্নত উদ্ধত স্তনযুগল দিয়েও ওকে জাগাতে পারছে না। এমন হাল আগে দেখেনি।

ক্লডিও অন্য দুনিয়ায়। শুধু বুঝতে পারছে না লোকটা কেন অন্যমনস্ক।

ইয়্যানাকোচা বিস্ফোরণ নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্বজোড়া ব্যবসা। অ্যামেরিকার সঙ্গে ভালোই যোগাযোগ। এর সঙ্গে কী ডাও জোনসের কোনও সম্পর্ক আছে? থাকলেও অ্যামেরিকা সরাসরি জড়াবে না। চায় না অর্থনৈতিক সঙ্কটে ডলারের দাম পড়ে। বোঝার চেষ্টায় কে এর থেকে লাভবান হতে পারে। সামান্যতম ক্লুও নেই। হয়ত অন্য কোনও দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে অ্যামেরিকাকে সরিয়ে প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইছে।

কে?

ক্লডিওর মুখ দেখে গ্যাব্রিয়েলা টের পাচ্ছে এ মুহূর্তে মোটেই ফুর্তির মুডে নেই। কোনও ব্যপারে চিন্তিত। যতক্ষণ না সুরাহা হবে, ক্লডিও ছাড়াই ওকে ভিলার সুখ সুবিধে উপভোগ করতে হবে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আশায়, কী ভাবছে বোঝার জন্যে, গ্যাব্রিয়েলা প্রতীক্ষায়।

***

সারাদিনের ছোটাছুটির পর বাড়ি ফিরে লাজবন্তী রাতের খাওয়ার বানাতে ব্যস্ত। আত্রেয়ী যদি হান্স গ্রুবার মারফৎ কোনও বিদেশি দলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, সেটা অবশ্যই ভুল জায়গায়। সম্ভবত দুজনেই ওই দলের হাতে মারা পড়েছে। ভবানী ভবন আর অনিমেষ দাসের থেকে জেনেছে, যে ছেলেটির মৃতদেহ হোটেলে পাওয়া গেছে তা দ্বৈপায়নের এটা প্রমাণিত। যদিও মোবাইল নম্বরের পার্থক্যটা এখনও মেটেনি। যদিও র-কে ব্যপারটা দেওয়া হয়েছে, তার অনুসন্ধিৎসু মন এর থেকে বেরোতে পারছে না। খুনগুলো একটা অন্যটার সঙ্গে জড়ান। এবার র আর সিবিআই হাত মিলিয়ে মোটিভটা বার করুক।

রহস্যময়ী জিয়াই দু'য়ের যোগসূত্র। তাকে সনাক্ত করলেই রহস্যের দরজা খুলে যাবে। ওর আসল পরিচয়ই বা কী?

ডিনারের পর বাচ্চাকে শুতে পাঠিয়ে লাজবন্তী বই পড়ে। আজ সে বাঁধা রুটিনে ছেদ। যদি খুন দুটো জড়িয়ে থাকে নিশ্চয়ই কাছের কেউ বিদেশি দলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়েছে। কে? এলেনা? দ্বৈপায়ন নোটবুকে নিয়মিত ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে গেছে। তাহলে কি এলেনাই জিয়া হয়ে বিদেশি দলের হয়ে কাজটা করেছে? স্কাইপে জিয়া আর দ্বৈপায়নের কথোপকথন সবই সেক্স নিয়ে। যাকে সম্মান করে তার পক্ষে দ্বৈপায়নের সঙ্গে কিত্রিম সম্পর্কে যাওয়া সম্ভব?

পরদিন অফিসে ঢুকেই জানাল কিছুক্ষণ ব্যস্ত থাকবে। তাকে যাতে বিরক্ত না করা হয়। সুবিমলের রিপোর্টে এলেনার নম্বর আছে। ফোনে ধরল, ‘লাজবন্তী সেন, আইজি সিবিআই। প্রশ্ন আছে।’

এলেনা অবাক। সামলে নিল, ‘বলুন’

‘দ্বৈপায়ন নামে কাউকে চেনেন?’

‘হ্যাঁ। ভাইয়ের মতো। দিল্লিতে যখন থাকত সাহায্যও করেছি।’

‘ওর কোনও গার্লফ্রেন্ডকে চেনেন?’

‘শুনেছি আত্রেয়ী বলে কারও সঙ্গে সম্পর্ক। কখনো দেখিনি’ দিল্লি-কলকাতা ফ্লাইটে যে দেখা হয়েছিল এড়িয়ে গেল।

‘জিয়া বলে কারও নাম শুনেছেন?’

‘না। সে কে?’

ডিটেলে গেল না লাজবন্তী। জিগ্যেস করল, ‘কিছু ব্যক্তিগত কথা জানার আছে’

‘বলুন।’

‘আপনার বয়ফ্রেন্ড নেই?’

‘ঠিক বুঝলাম না। যদি পুরুষ বন্ধু বলেন, অনেক। কেউ প্রেমিক নয়।’

‘ধন্যবাদ।’

ফোনটা কেটেই দিচ্ছিল, কী মনে হতে বলল, ‘নিশ্চয় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। দ্বৈপায়ন আমার খুব কাছের। ওর মৃত্যুটা মেনে নিতে পারছি না’

‘চেষ্টা করছি’ লাজবন্তী ফোন কেটে দিল।

ডিউটির মাঝখানে অমৃতার ফোন, ‘হান্স গ্রুবারকে পেয়েছি। গ্যেটে ইন্সটিটিউটের শিক্ষক। তবে বাইরের কোনও যোগাযোগ আছে কি না জানি না।’

‘এলেনা চৌধুরী নামে একজনের খোঁজ বার করতে পারবে?’

‘এই কেসের সঙ্গে যুক্ত?’

‘হ্যাঁ, দ্বৈপায়নের ঘনিষ্ঠ। কনফার্ম করেছে দ্বৈপায়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা। যোগ থাকলেও থাকতে পারে। হতেও পারে নিজেই জড়িত। হান্স গ্রুবারের আর ওর মধ্যে যোগ থাকলে তলিয়ে দেখলে রহস্যের জাল খোলা সম্ভব।’

‘ডিটেলস পাঠাও।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, দিচ্ছি।’

মাথায় জিয়ার নামটা ঘুরছে। মোটিভ? হোমিসাইডের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। নিজের ধারণা জানিয়ে সিবিআইকে রিপোর্ট দিয়ে কাজে ডুব দিল। একগাদা কেস পেন্ডিং।

***

প্রথমটায় চীনের লোয়েস মালভূমিতে হালকা কাঁপন। জায়গাটার পুবে তাইহাংশান, পশ্চিমে কুইলিয়ানশান, দক্ষিণে কুইনলিং পাহাড়, উত্তরে দ্য গ্রেট অয়াল অফ চায়না। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ থেকে ২০০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এলাকাটা বিস্তৃত ৫০০,০০০ কিমি জুড়ে। দীর্ঘকাল ধরে বৃষ্টি আর নদীস্রোতের ফলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে পুরু। ছিদ্রযুক্ত হলদেটে পলিমাটিতে মালভূমিটা আচ্ছাদিত।

ভোর তখন চারটে। ঘুমিয়ে থাকায়, লোকে প্রাথমিকভাবে হালকা কম্পনটা বুঝতে পারেনি। আচমকা সেটা ফেটে পড়ল। দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ধ্বসে পড়তে লাগলো ঘরবাড়ি। কী হল বোঝার আগেই, যে যার আস্তানা থেকে বেরিয়ে বিরাট ধ্বংসস্তূপে।

কেউ টেরই পায়নি কখন আরও বীভৎস একটা ভূকম্পন চীনের দক্ষিণ-পুবে কিংঘাই-তিব্বত মালভূমিকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এলাকাটা চীনের সবথেকে বড় মালভূমি। আয়তনে ত্রিশ লক্ষ বর্গকিমি, অর্থাৎ গোটা দেশের ভূভাগের প্রায় এক চতুর্থাংশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ থেকে ৫০০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই মালভূমিকে বলা হয় ‘পৃথিবীর ছাদ’। চারদিকে হিমবাহে ঢাকা কুনলুন শান, কিলিয়ান শান, হেংডুয়ান শান আর হিমালয় পর্বতশৃঙ্গমালা ঘেরা এই কিংঘাই-তিব্বত মালভূমিতেই চীনের প্রধান নদীগুলোর উৎস। অঞ্চলটিতে বিরাট সংখ্যক মানুষের বাস। শহরগুলো ধ্বসে পড়ায় মানুষজন মারা পড়ল। গোটা চীন প্রবল ভূমিকম্পের কবলে বিধ্বস্ত। চীনা নিয়ম অনুযায়ী বাইরের দুনিয়ায় খবর পাঠাতে হলে সরকার ও তার গোয়েন্দা বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন। এই বিশাল বিপর্যয় বহির্বিশ্বের কাছে তখনও অজানা।

পাঞ্চেত জোংপা মনাস্টেরিতে বসেই কম্পন টের পেয়েছিল। জানত না এ কেবল কম্পনের কেন্দ্রভূমির বাইরের বৃত্তমাত্র। ধ্যানে বসেই জানতে পেরেছিল কাছাকাছি কোথাও প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ইঙ্গিত। বুঝতে পারেনি ঠিক কোথায়। যদিও আন্দাজ জায়গাটা খুব দূরে নয়। একবার ভাবল এলেনাকে ফোন করবে। সেটা ঠিক হবে কি না ঠিক করতে পারল না। এখন সকাল। হয়ত ঘুমোচ্ছে। দৃঢ় প্রমাণ ছাড়া এ কেবল অনুমান মাত্র।

লোয়েস মালভূমির বিপর্যয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করে ওঠার আগেই ইউনান-গুইঝো মালভূমিতে আরেকটা ভূমিকম্প। ৫ লক্ষ বর্গকিমি জোড়া এই এলাকার মধ্যে পড়ছে পূর্ব ইউনান প্রদেশ এবং গুইঝো

অঞ্চলের অধিকাংশ অঞ্চল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১ থেকে ২ হাজার মিটার উঁচুতে এ অঞ্চলের মধ্যের ভূখণ্ড উত্তরপূর্ব থেকে দক্ষিণপূর্বে বিভিন্ন পর্বতশিরা, উপত্যকা ও রুক্ষ ভূমি নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে কিছু ছোট পার্বত্য উপত্যকাও রয়েছে। উর্বর মাটির জন্য কৃষিকাজে সুবিধা বলেই ঘন বসতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিপর্যয়ের পর এবার প্রাকৃতিক রোষের কবলে এই বিস্তীর্ণ এলাকাও।

ধ্যানে পাওয়া উপলব্ধিতেই পাঞ্চেত টের পেয়েছিল। ঐশী পরাশক্তিই জয়ী হয় যখন মানুষ অহংকারের বশে তাকেও পেরিয়ে যেতে চায়। সেখানে প্রকৃতিই রক্ষক হিসেবে এগিয়ে আসে। তা সে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে অগ্নুৎপাতই হোক বা চীন, তিব্বত বা ভারতে ভূমিকম্প। প্রকৃতি এবার তার লাগাম হাতে তুলে নিয়েছে। সে আর কী করতে পারে, মানবতার ভালো আর প্রয়াত জনেদের আত্মার প্রতি প্রার্থনা ছাড়া?

শেষে নিউজ বুলেটিনে খবরটা এল। এলেনাও শুনল। উত্তর-পূর্ব ভারত, তিব্বত আর চীনে বিরাট ভূমিকম্প। সঙ্গে বিপর্যয়ের ছবি।

পাঞ্চেতের জন্যে আতঙ্কিত, 'ঠিক আছ তো?'

'হ্যাঁ'

'ভূমিকম্পের খবর দেখাল।'

'আগেই জানি। এটাই ভবিতব্য।'

এলেনা অবাক। ভগবৎ গীতার শ্লোক মনে পড়লঃ

'যদা যদা হি ধর্মস্য, গ্লানির্ভবতি ভারত

অভ্যুত্থানম অধর্মস্য, তদত্মানম সৃজম্যহম

পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'

মাথায় ঢুকছে না মানুষটা কীভাবে জানতে পারে। বুলেটিনেও খুব স্পষ্ট নয়। জানতে চাইল, 'কী করে জানলে?'

পাঞ্চেত হাসল, 'অনুভবে। মনাস্টেরিতে একটু কাঁপন টের পেয়েছিলাম। মনে হল ভূমিকম্প। কিন্তু কোথায় তার হদিশ ছিল না। প্রকৃতি নিজের মতো করে ঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসবে। বিশ্বে যা শক্তি আছে তার সঙ্গে ভারসাম্য রেখেই চাওয়াকে বেঁধে রাখতে হয়। বিশ্বে শক্তি সীমিত। অথচ চাহিদা বেড়েই চলেছে। সামাল দিতে শক্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে, যা আপাতভাবে অসম্ভব। নইলে চাহিদা কমাতে হবে। প্রকৃতি এসব বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েই রাশ টানে। নিশ্চয় অনেকের প্রাণ গেছে। তাদের জন্যে প্রার্থনা করি। বিপদের মধ্যেই প্রকৃতি মানুষের কল্যাণ চায়।'

'তোমায় নির্বিকার দেখে অবাক লাগছে।' এলেনা বলল।

'আমায় অসংবেদনশীল মনে কোরো না। যারা মারা গেল তাদের জন্যে নিশ্চয়ই দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু মনুষ্যজাতির কল্যাণে ভারসাম্যটা জরুরি। ওদের জন্যে প্রার্থনা করো। শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখাই মুখ্য।'

কঠিন সত্যটা বুঝতে পারছে। লোকটা বিজ্ঞানের থেকেও বেশি বোঝে বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব নিয়মকে। কাছে না থেকে কাজে দিল্লি চলে আসার জন্যে খারাপ লাগছে। কত কী শেখার এখনো বাকি! অথচ ওই তো এ কাজটা নেওয়ার সাহস জুগিয়েছে। জীবন মানে তো শুধু তত্ত্ব উপলব্ধি নয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগও। সচেতনভাবেই বলেছিল শুধু ওর শিক্ষায়ই নয়, জীবন থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে।

এলেনা চৌধুরীর তাও বেছে নেওয়ার সুযোগ ছিল, ওর তো তাও ছিল না।

***

প্রায় বছরখানেক আগে মার্ক হেনলি আর রেইনার স্মেলঝাইসেন নাইল ক্রুজের পরিকল্পনা করে। অ্যামেরিকার মতো অভিবাসীর দেশ যদি সুপারপাওয়ার হতে পারে, রাশিয়া যদি প্লেটোর নীতিকে ভিত্তি

করে, কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব অনুসরণ করে প্রায় সমান ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, তাহলে ইইসি-ই বা কেন হাতেহাত মিলিয়ে সেই স্তরে পৌঁছতে পারবে না? ব্রিটেনের প্রধান আয় ব্যাঙ্কিং। দুদেশেরই প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়েই বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদকে বিশ্ববাজারে হাজির করতে পারবে।

তা দখল করার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় বাধা লেবারের চড়া দাম। যদি গরিব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আর সস্তা শ্রম কাজে লাগাতে পারে তাহলেই শুধু সম্ভব। শুধুমাত্র তেল বা গমই বিশ্বের অর্থনীতি চালায় না। অন্য সম্পদও আছে। ইইসির বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে অন্যান্য দেশের সম্পদ আর ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সুলভ শ্রম দিয়েই তা সম্ভব।

তার বাকিংহামশায়ার ম্যানসনে মার্ক যখন প্রিয় সিঙ্গল মল্ট নিয়ে ব্যস্ত নাইল ক্রুজের পরে হঠাত রেইনরের ফোন, ‘প্ল্যানটা ঠিক খাটছে না। কেন?’

মার্ক এডিনবরা ক্রিস্টালের মদের গ্লাসটা টেবলের ওপর রাখল, ‘কে জানে। পার্সেন্টেজ বাড়িয়ে দেখ কাজ হয় কি না।’

‘কথা বলে দেখ কাজ হয় কই না’ রেইনার বলল।

‘তাই তো করছি’

রেইনর নির্বোধ নয়। সন্দেহ হচ্ছে। মার্ক দুমুখো সাপ নয়ত? অ্যামেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে কী খেলাচ্ছে? যত শালীন, বুদ্ধিমান, নরম স্বভাব, কম কথার লোকই হোকই না কেন, অ্যাংলো-স্যাক্সন ব্রিটিশদের বিশ্বাস করা মুস্কিল। তাই পূর্বপুরুষরা অ্যামেরিকার আদি বাসিন্দে রেড ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে দেশটার দখল নিতে পেরেছে। নীল রক্তের ব্রিটিশরা জার্মানির সঙ্গে দুটো মহাযুদ্ধে জিতেছে। জার্মানরা অ্যাংলো-স্যাক্সন উৎসের বাইরে।

‘যেভাবেই পারো দেখ। বাগে আনতেই হবে।’ রেইনর ফোন কাটল।

ঠিক করল পুরনো বন্ধু জাপানকে সঙ্গে নিতে হবে। প্রতিবেশী সুইজারল্যান্ডের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। তখন থেকেই রেইনারের অন্য ছক। অপ্রত্যাশিত ভাবে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত সব ভেস্তে দিল।

***

ভূমিকম্পের খবরে আলঘানিম মন্ত সে তুং-কে ফোনে ধরল, ‘ঠিক আছ?’

‘দারুন।’

‘তোমাদের ওখানে ভূমিকম্পের খবর পেলাম।’

‘বেজিং-এ নয়।’

‘কোথায়?’

‘ঠিক বলতে পারব না। বোধহয় দক্ষিণ-পূর্বে কোথাও।’

‘কোথায় জানো না?’

‘ডিটেল দিতে পারব না। কেবল এটুকু বলছি, আমরা ঠিকই আছি। আগের মতোই ব্যবসা চলছে।’

আলঘানিম বুঝল। আর বেশি প্রশ্ন করলে সম্পর্কে চির ধরতে পারে।

‘কেন আমার গরিবের আস্তানায় চলে আসছ না? যত চাও সুন্দর সুন্দর ইরানি মেয়ে পাবে’

‘অন্য কখনও। জানোই তো ইরানি আর লেবানিজ মেয়ে আমার পছন্দ।’

কিছুই হয়নি এরকম ইম্প্রেশন দিলেও আলঘানিম ঝামেলার আঁচ করল। বসেরের স্তনে হাত বুলিয়ে তার উত্তেজিত নিপল নিয়ে খেলা করতে করতে ফোন কেটে বসের আল লতিফাকে নিয়ে পড়ল। কথা বলার সময়ই বসের বিবস্ত্র। ইতিমধ্যে ডেলবার গোলাপি নাইটি পরে ভেতরে। মেয়েটা যখন ওর দিশদাশা খুলছে, গোপনাঙ্গে উত্তেজনার পারদ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসা কখনও যৌনতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে না। নীল জিনস সাদা টপে মালিহেহ পেছনে শোলেহকে নিয়ে ঢুকল।

শোলেহ সোজা বারের দিকে, 'আজ কোন ড্রিঙ্ক?'

'আমার ফেভারিট, দ্য মাকাল্লান সিক্সটি-ফোর-ইয়ারস ওল্ড ইন লালিক। অন দ্য রক্স।'

শোলেহ চারটে গ্লাসে, ওর জন্যে চারগুণ পরিমাণে ঢেলে আনল। যদি ভুলে যায় এই ভয়ে নিজের ওষুধটা টেবলে রাখল। ওর এই রুটিন সম্পর্কে ওরাও ওয়াকিবহাল।

ওদের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আগে একটু ওয়ার্ম আপ করে নেওয়া যাক।'

নগ্ন ডেলবার জানতে চাইল, 'কটা বরফ?'

'চারটে। আমি বিজ্ঞান মেনে চলি। প্রত্যেক বড় পেগের জন্য একটা। বেশিতে স্বাদ নষ্ট হয়।'

ডেলবার বার ট্রলিটা ওর দিকে ঠেলল। শোলেহর দিকে তাকাল, 'কাবাব কই? পাছা দিতে বলো।' ভেড়ার মাথা, নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি দিয়ে বানানো ঐতিহ্যবাহী এই ইরাকি খাওয়ার দারুণ প্রিয়। 'শোলেহ খেয়াল রেখ আবার ঘরে না এসে পড়ে। ড্রেস পরে থাক যতক্ষণ না আনে।'

ফুর্তির সময় অন্য পুরুষ কাম্য নয়। সেবা আর শারীরিক তৃপ্তির জন্যে সবাই এক পায়ে খাড়া। ডেলবার আর বসেরকে দুপাশে নিয়ে প্রিয় স্কচে চুমুক। শোলেহ খাওয়ারের অপেক্ষায়। নগ্ন মালিহেহ কার্পেটের ওপর, আলঘানিমের দু-পায়ের ফাঁকে বসে ড্রিঙ্কসে চুমুক দিচ্ছে।

চারটে বউ সম্বন্ধে কোনও আগ্রহই নেই। ওরা শুধু বাচ্চা পয়দার যন্ত্র মাত্র। ওদের কাছ থেকে যৌন সুখের প্রশ্নই ওঠে না। এখন ওর জাব্রিয়া ম্যান্সনে নয়, বাড়ি থেকে বেশ ক'মাইল দূরে। এখানে বৌদের আসা বারণ। কেবল তাদেরই প্রবেশাধিকার যারা যৌন সুখের সহচরী। একজনের সঙ্গে সঙ্গমে অরুচি। একসঙ্গে অরগির মধ্যেই কামরস। অক্সফোর্ডে পড়া কামসূত্রের বিভিন্ন পজিশনের ব্যবহারিক প্রয়োগ যা ব্রিটেনে করতে পারেনি।

শোলেহ এর মধ্যেই কাবাব আর পাছা আনতে বেরিয়ে গেছে। ঢুকতেই থামাল, 'ওগুলো টেবলে রেখে এক হাতে পাছা প্লেটটা নিয়ে স্ট্রিপ শো কর।'

কঠিন। কিন্তু করতেই হবে। অনুরোধ নয়, আদেশ। বাঁ হাতে প্লেট নিয়ে সাবধানে যাতে মেঝেতে না পড়ে নজর রেখে ডান হাতে পোশাক খোলা শুরু। সম্পূর্ণ হতে ওগুলো টেবলে।

'খিদে পেয়ে গেছে। খাওয়া যাক।' আলঘানিম বলল।

একই প্লেট থেকে খেতে খেতে টেলিভিশনটা চালিয়ে দিল। দুনিয়ায় কী হচ্ছে জানতে হবে তো।

শুনে চমকেই উঠেছিল ও।

সৌদির ঘাওয়ার অয়েল ফিল্ড আর ভেনিজুয়েলার ওরিনোকো টার স্যান্ডসে বিরাট বিস্ফোরণ! ঘাওয়ার অয়েল ফিল্ড সৌদি আরবের আটটা তৈলক্ষেত্রের অন্যতম। ওরিনোকো থেকেও দিনে তেল ওঠে ১০০ ব্যারেল। এর মানে বিশ্বের দু-দুটো প্রধান তৈলক্ষেত্রে একসঙ্গে আক্রমণ। হতেই পারে সেনাবাহিনীর কাজ বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা। হয়ত কোনও শক্তি বিশ্ব অর্থনীতিকে মুঠোয় পুরতে চাইছে। আতঙ্কে এতক্ষণ ধরে বেড়ে ওঠা উত্তেজনা নেতিয়ে। মধ্যপ্রাচ্য আর দক্ষিণ অ্যামেরিকার অর্থনীতি যদি আক্রান্ত হয়, নিজের অর্থনীতিও শুয়ে পড়তে বাধ্য। মেয়ে নিয়ে ফুর্তি বেরিয়ে যাবে। মাথা থেকে ফুর্তি হাওয়া। দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে মস্তিষ্ক। আশেপাশে বসের, ডেলবার, শোলেহ বা মালিহেহরা কে কী করছে সেদিকে নজর নেই। এই মুহূর্তে কোনও মেয়ের ক্ষমতাই নেই নেতানো উত্তেজনাকে চাঙা করে। যৌনতার চেয়ে অনেক জরুরি, কী হল সেটা আগে বোঝা।

বিশ্বে এই মুহূর্তে যা হচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে কোথায়। প্রবর্তা কে বোঝার জন্য ভাবার সময় চাই। কাউচে এলিয়ে ঝড়ের গতিতে হিসেব কষছে। পরিস্থিতিটা বুঝতে। নিজের বুদ্ধিতেই পৌঁছতে হবে ঘটনার কেন্দ্রে। যেভাবেই হোক আত্মরক্ষা করতে হবে। মধ্য প্রাচ্যকেও।

***

হট লাইনে অমৃতা খিকখিক করে হাসছে, 'ঈশ্বরের দোহাই লাজবন্তী, এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। তুমি যার তার পেছনে দৌড়তে বলছ। যার কথা বললে সে একটা ছোট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের সেলস ম্যানেজার। চিত্তরঞ্জন পার্কে থাকে। বিয়ে হয়নি।'

'সোশ্যাল?'

'তেমন নয়। গুটি কয়েক বন্ধু। অধিকাংশ সময়ই নিজের হবি নিয়ে থাকে।'

'ব্যাকগ্রাউন্ড?'

'পশ্চিম সিকিমের সেন্ট মেরিজ কনভেন্টে পড়া। কম বয়েসে মা-কে হারিয়েছে। বছর কয়েক আগে দিল্লিতেই থাকা বাবাকেও। দিল্লি ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। আলাদা কিছু বলার নেই।'

'একেবারেই নয়?' লাজবন্তী এতটা আশা করেনি, 'দ্বৈপায়নের ঘনিষ্ঠ ছিল। কিছু মেলও দেখেছি। তবে সবই কেরিয়ার ঘিরে। ছেলেটা যৌনতা নিয়ে চ্যাট করত জিয়ার সঙ্গে। তাহলে জিয়া কে?'

'আইপি অ্যাড্রেস থেকে ট্রেস করো।'

'চেক করেছি। মুম্বাইয়ের অ্যাড্রেস। হতেই পারে এ-ই দুজনকে খুন করেছে। খটকা লাগছে আত্রেয়ীও তো দিল্লি থেকে ফ্লাইট ধরেছিল। জিয়াই যদি কালপ্রিট হয় ওই ফ্লাইটে কী করে?'

'ভিপিএন ব্যবহার করেনি তো?'

'তাই যদি হয় বার করা কঠিন।'

'ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লিস্ট চেক করো। যদিও ওই নামে পাবে কাউকে কি না সন্দেহ। সম্ভবত ভুয়ো নামেই।'

'হতেও পারে। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট বলছে দুটো খুনই সুইশ মিনি-গান দিয়ে। ভারতে ব্যবহৃত হয় না। হয়ত ফরেন লিঙ্ক আছে। আবার নজর সেই গ্যেটে ইন্সটিটিউটের হান্স গ্রুবারের দিকেই। ওর ফরেন লিঙ্ক চেক করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই। সিবিআই বা ইন্টারপোলকে ছেড়ে দিলেই তো হয়।'

'দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওদের তো কিছু লিড দিতে হবে।'

ফোন কেটে লাজবন্তী আত্রেয়ীর প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আবার দেখল। এয়ারপোর্টে বুলেটে মৃত্যুর পর চার্নক হাসপাতালের এমারজেন্সিতে নিয়ে যাওয়া। ওখানেই মৃত ঘোষণা। আর যদি রিপোর্টে কিছু থাকে। বলা আছে এক মহিলা গুলির পর থেকেই তার সঙ্গে চার্নক অবধি ছিল। নাম এলেনা চৌধুরী। ফরেন লিঙ্ক থাকতেই পারে। এই-ই জিয়া নামে ভাঁড়িয়েছিল কি না দেখা দরকার।

হান্স গ্রুবার বা এলেনাই সম্ভাব্য ক্লু। এদের বিদেশি যোগাযোগ থেকে সুইশ মিনি-গানের ব্যবহারের হদিশ মিলতে পারে। ভবানী ভবনের কাছে দীপাঞ্জনের ডিটেল, ফরেন্সিক রিপোর্ট আর হোটেলের ঘরে পাওয়া ফিঙ্গারপ্রিন্টের কপি চেয়ে পাঠাল। যদিও রিপোর্টে বলা হয়েছে, আত্রেয়ীর আইডি পাওয়া যায়নি তবুও ওর জিনিসপত্রের ডিটেলসও। এলেনাই কী ফ্লাইটে ওগুলো সরিয়ে দিয়েছে? নিতেই পারে। কিন্তু কেন? প্লেনে ওঠার সময় আত্রেয়ীর নিশ্চয়ই একটা পরিচয় পত্র লেগেছিল। মোবাইলটাও চাইল। অনেক সময় ওখানেও থাকে।

সামান্য একটু ভুলে তদন্তটা ভুল দিকে যেতে পারে। সুনামের জন্যে কোনও সম্ভাবনাকেই না ঘেঁটে ছাড়া যাবে না। সিবিআই-এরও এগোতে গেলে কিছু সূত্র লাগবে। বিদেশি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে জিয়ার পরিচয়টাও কাজে লাগতে পারে।

লাজবন্তীর মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। দীপাঞ্জনের মৃতদেহের ছবি, সুইশ মিনি-গান ব্যবহারের ব্যালিস্টিক প্রমাণ। লিন্ডসেতে দীপাঞ্জনের হোটেলের ঘর থেকে আঙুলের ছাপের রিপোর্টে দীপাঞ্জন ছাড়াও অনেকের আছে। হোটেলের স্টাফ বোর্ডারদের মধ্যে থেকে খুনিকে সনাক্ত করা কঠিন। যদিও মৃতদেহের মাথা বুলেটে ঝাঁঝরা,

তবু অনিমেষের থেকে পাওয়া ছবির থেকে ছেলেটার মুখের আদল আন্দাজ করার চেষ্টা করছে। মিল আছে। আত্রেয়ীর মালপত্রের মধ্যে পরিচয় নেই কিন্তু তার মোবাইলের ডিজি লকারে আধার কার্ড, প্যান, ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে। সঙ্গে ই-টিকিটও। নিশ্চিত ও-ই আত্রেয়ী ব্যানার্জি। ওই দিয়েই চেক-ইন করেছিল। ওকেও খুন করা হয়েছে সুইশ মিনি-গান দিয়ে। খুনি যে-ই হোক সে-ই এদের দুজনকে খুন করেছে। দুটোই একই দিনে, একই ধরনের অস্ত্রে। শহরে খুনির উপস্থিতির এটাই প্রমাণ।

একই ফ্লাইটে আততায়ীর উপস্থিতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহভাজনের তালিকায় এলেনা একেবারে ওপরে। সে ওর সঙ্গেই ছিল। আবার দীপাঞ্জন ওরফে দ্বৈপায়নের সঙ্গেও যোগ। এক ফাঁকে জিয়া নাম নিয়ে হোটেল হ্যামিলটনে গিয়ে ওকে সরিয়ে দেওয়াতে অসুবিধে নেই। সুইশ মিনি-গান হ্যান্ডব্যাগেই নেওয়া যায়। সন্দেহের তালিকায় এলেনাকে রাখতেই হয়।

এবার খুঁজে বার করা এই জিয়ার সঙ্গে বিদেশি যোগসূত্র। খুনের মোটিভও হয়ত সেখানেই।

***

মার্ক হেনলি স্যাঁতসেঁতে ব্রিটিশ আবহাওয়ায় নিজের ডালউইচের বাংলোতে শিউরে উঠল। তলিয়ে যাওয়া ব্রিটিশ অর্থনীতিকে দ্রুত চাঙা করতে তার মেকি প্ল্যান ফাঁস। খবরের কাগজে হেডলাইন। নিস্তার পেতে হাই স্ট্রিটের ব্যাঙ্কগুলো থেকে ফোনের পর ফোন। এতদিন ব্রিটিশ অর্থনীতির ধ্বস লোকের আন্দাজেই ছিল। এখন দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ।

অক্সফোর্ড-ফেরতা চৌকশ মার্ক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অতীত গৌরবে আচ্ছন্ন। গত দশকেরও বেশি সময় ধরে মার্কিন অর্থনীতির হাতের পুতুল। ব্রিটেনের প্রাকৃতিক সম্পদ তো কিচ্ছু নেই। অ্যামেরিকা থেকে মুক্তির আশায় ব্রিটিশের অতীত গৌরবকে ফেরাতেই এই প্ল্যান। ওদের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ ধারের ব্যবসা। যদি কোনওভাবে এটাকে কাজে লাগিয়ে পুনরায় ধ্বসে পড়া অর্থনীতিকে চাঙা করতে পারে। মার্কের ধারালো বুদ্ধি কাজ শুরু করে। ঘটনাচক্রে মাথায় পিপিআই বা পেমেন্ট প্রোটেকশন ইন্সিওরেন্সের আইডিয়াটা খেলে যায়। ব্যাঙ্কের পলিসিমেকারদের নিয়ে গোপন মিটিঙে লাভের দিকটা তুলে ধরে মুনাফাটা দেখায়।

‘ক্রেতা আর ছোট ব্যবসায়ীদের লাভের দিকটা বোঝাতে পারলেই হবে।’

‘কী ভাবে?’

‘আজকের দরে বিক্রি করতে পারলে আমাদের লাভ। বিরাট অর্থনৈতিক ধাক্কা আসছে। ক্রেতাকে আমরা পেমেন্ট প্রোটেকশনের গ্যারান্টি দিচ্ছি। ওদের কন্ট্র্যাক্ট কন্ডিশনে বাঁধা থাকবে। নইলে আজকের অঙ্কে বড় পরিমাণে খেসারত দিতে হবে। এতে কন্ট্রাক্টের বাইরে বেরতে সাহস পাবে না। এটা ফুটনোটে থাকবে। না মানলে বিরাট অঙ্কের ক্ষতিপূরণ। বেশিরভাগই ভয়ে সাহস করবে না। এভাবেই টাকা তুলে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। স্টার্লিংকে যেভাবে হোক তুলতে হবেই। এছাড়া কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না।’

‘ইইসি ধাপ্পাটা ধরতে পারবে না?’

‘মনে হয় না। আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আঁচও করলেও অন্যরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাতে চাইবে না। নিজেদের দেশে কী পলিসি একান্তইর্ণ আমাদের। এরকম সিদ্ধান্ত নিতেই পারি।’ মার্ক কফিতে চুমুক দিল।

পরিকল্পনাটা অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কই রাজি। পথ যা-ই হোক না কেন, লক্ষ্যটাই মুখ্য। প্ল্যান মাফিক বিক্রিও হল। টাকাও আসতে লাগল। এক্সচেকার ফুলেফেঁপে উঠল। স্টার্লিং ইউরোকে টপকে গেল। বুঝিয়ে দেওয়া ইইসিতে ব্রিটেনের জায়গা অন্য। দূরদৃষ্টির জন্যে প্রশংসাও আছড়ে পড়ল। রাজনৈতিক পদে না থাকা সত্ত্বেও দেশকে লোকের চোখে বড় করে তুলেছে।

খবরের কাগজের হেডলাইনে মার্কের চক্ষুস্থির।

কেউ প্যাঁচটা ফাঁস করে দিয়েছে। খদ্দেররা ঘোল খাওয়ায় বিরক্ত। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো তারই পরিকল্পনা তাকে শুইয়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর। কপাল থেকে ঘাম মুছল। যেহেতু এটা ওরই প্ল্যান, ব্যাঙ্কিং সেক্টর এর

থেকে বেরনোর উপায় বাৎলাতে ওকেই চেপে ধরেছে। সেদিনের আইডিয়া মুহূর্তের। এই চক্কর থেকে বেরোনোর উপায় খুঁজছে। এখন আর বোঝানোর কিছু নেই। বাঁচার জন্যে ডেভিড ডালটনের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া। ডেভিড জাতে ইহুদি। রক্তে অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টিই স্বাভাবিক। ঠিক করল, ওর সাহায্য নেবে না। বিশেষ করে যখন ওর নিজের দেশই ঝঞ্ঝাটে, সাহায্য করবে কি না সন্দেহ। করলেও সঙ্কটের সময়ে বাড়তি সুবিধে ধান্দা করতে পারে।

বিরাট দোনামোনায় যখন মরিয়া হয়ে পথ খুঁজছে হঠাত আলঘানিমের ফোন, 'তেলের খনিগুলোতে বিস্ফোরণের খবর পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, খবরে শুনছি।'

'বিশ্ব তোলপাড়। কার কাজ?'

'বিশ্ব অর্থনীতি জড়িত। প্রমাণ ছাড়া কিছু বলা মানেই ঝামেলা।' মার্ক ঠাণ্ডা।

'কেউ কী গোপনে ছুরি মারছে? কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'পরে এ নিয়ে কথা হবে। ঝামেলায় আছি।'

'কী হল?'

'পরে বলব। আগে ঝামেলা থেকে বেরোই।'

'ফাঁকা পেলে ফোন কোরো।' ফোন কেটে দিল।

কর্নফ্লেক্স, বেকন, টোস্ট, স্ক্র্যাম্বলড এগে মন দিল। মাথায় কেবল সমস্যা থেকে কীভাবে বেরোনো যায়। অনেক সময় অন্যদিকে মন দিলে সমাধান আপনা থেকেই মাথায় খেলে যায়। গ্রিস ইইসি ছাড়তে চায়। ওখানে যদি কিছু ঘটানো যায়, লোকের নজর ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব। যদি ওখানকার প্রেসিডেন্টকে খুন করা যায়, লোকের চোখ সেদিকেই ঘুরে যাবে। মিডিয়াও তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। সেই ফাঁকে ভাববার সময়ও পেয়ে যাবে।

প্রফেসানাল হিটম্যান সুইজারল্যান্ডের জনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে যাচ্ছে এমন সময় ডেভিড ডালটনের মেসেজ, 'অজানা কার হাতে জন খুন। কারণ, অজানা।'

আন্দাজের বাইরে আচমকা বিরাট ধাক্কা।

***

বিনোদ কারাটের পারলৌকিক কাজকর্ম ধুমধাম করেই হল। মিটে যেতে প্রমোদ এলেনাকে দেখা করার জন্যে ফোন করল।

চিত্তরঞ্জন পার্কের ফ্ল্যাটের ড্রয়িংরুমে ওর আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে। এলেনা রান্নাঘরে কফি বানাতে ব্যস্ত। ছবিগুলো ভালোই লাগছিল। এলেনার শখটার কথা জানা।

এলেনার হাত থেকে কাপটা নিয়ে বলল, 'এসব করে দিব্যি সময় কাটাচ্ছ।'

'হ্যাঁ। আমি সাধারণ। তোমার মতো ব্যস্ত লোক হলে অন্য কথা।'

কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু এখনো বাবার মারা যাওয়াটা মন থেকে নিতে পারিনি।'

'লুসার্নে বেলবয়ের কথার জন্যে?'

'বাবা প্রধানমন্ত্রী পদের দৌড়ে প্রচুর খাটছিল। অনেক ভেবে প্রতিটি পা ফেলত। সেই লোকের এরকম দুর্ঘটনা! ভাবাই যায় না। লোকটা কেন দেখা করেছিল? কে ওই লোকটা?'

'সুইশ ব্যাঙ্ক ট্র্যানজ্যাকশনের রেকর্ড থেকে মনে হচ্ছে কোনও সন্দেহজনক ডিলে জড়িয়ে পরেছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনও ক্লু নেই। চট করে বলা মুস্কিল। ঠিকই বলছ। সন্দেহ নেই সম্ভবত বিকেলে যার সঙ্গে দেখা করেছিল ডিলটা তার সঙ্গেই।'

'কেন?'

'আর কী হতে পারে? না জানলে অন্য কথা।'

'খুনটা করল কে?'

'পুরো ডিটেলস না পেলে বলা কঠিন। মনে হচ্ছে এতে আন্তর্জাতিক হাত আছে। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে, যে কেউ এর পেছনে থাকতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কার কী ধান্দা না জানলে বলা বোকামি।'

প্রমোদ সাবধান। তার বাবারও কম অনুগামী ছিল না। যদি বাবার দলের বিরোধীদের কেউ হয়, এতদিনে তা নিয়ে পার্লামেন্টে হইচই পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সুইশ ব্যাঙ্কের লেনদেনে জড়িত বিদেশি হাত জনসমক্ষে আনতে চায় না। গোপন রাখাই শ্রেয়। আচমকা কিছু করলে ফেঁসে যেতে পারে। তাতে বাবার ইমেজেরই ক্ষতি। সেটাই এখন বড়। তার থেকে ভারতের ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখা মানুষ হিসেবেই লোকে তাকে মনে রাখুক।

অসহায় লাগছে। এলেনা বাদে কারও সঙ্গে এত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনাও করতে পারছে না।

ওর মনের অবস্থা আন্দাজ করে এলেনা বলল, 'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কেন সাধারণ জীবনযাপনের পক্ষপাতী। সাফল্যের যেমন যাদু আছে, উল্টো দিকটাও মধুর নয়। সঙ্গিনীও ডিলের সম্বন্ধে না জানাই স্বাভাবিক। শুধু দেখা হয়েছিল এটুকুই আলোকপাত করতে পারে। খুনটা যে করেছে যথেষ্ট ট্রেইনড। যতক্ষণ না খুনের মোটিভ আর অর্গ্যানাইজারকে সনাক্ত করা যাচ্ছে ততক্ষণ কিচ্ছু বার করা যাবে না।'

প্রমোদ হতচকিত বসে। এলেনা ভুল বলেনি। বাবা যে টাকা রেখে গেছে তার ওপর নির্ভর করে চলা ছাড়া কিছু করার নেই। উঠবে, এমন সময় মোবাইল, অচেনা সিএলআই থেকে। বিদেশের কল।

'বিনোদ কারাতের ছেলে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'ড্যাডের অ্যাকাউন্টে যে ৫০ মিলিয়ন সুইশ ফ্রাঁ জমা দেওয়া হয়েছে ওটা ফেরৎ দিয়ে দাও।' গলাটা খসখসে।

'কে বলছেন?'

'জেনে লাভ নেই। যা বললাম, তাই করো। নইলে তোমার হালও ড্যাডের মতোই হবে।'

প্রমোদ থমকে ধাক্কা খেল। এলেনা লক্ষ করলওর মুখটা বিবর্ণ। কিছুই বুঝতে পারছে না। স্পিকারফোন অন করল এলেনা যাতে শুনতে পায়।

'যা বলছি, পরিষ্কার?'

এলেনা শুনছে।

'ফাইন। কোথায় পাঠাতে হবে?'

'সুইশ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরেই। টেক্সট করে দিচ্ছি। এটা অর্ডার।' ফোন কেটে দিল।

প্রমোদ এলেনার দিকে ফিরল, 'ঠিকই বলেছ। বাবা কোনও বিদেশি ডিলে জড়িয়ে গেছিল। যেই ওটা কাজ করেনি টাকা ফেরৎ চাইছে। না পেলে আমাকে মেরে ফেলার হুমকি। এই কলটাকে তো ট্রেস ব্যাক করা যায়।'

'চেষ্টা করতে পারো। লাভ হবে বলে মনে হয় না। কোনও কিয়স্ক বা জালি সিম থেকে করেছে। এরা অত্যন্ত ঘাগু। এসব ভুল করার পাত্র নয়।'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রমোদ কী বলবে ভেবে পেল না। অপেক্ষায়, এলেনা কিছু বলবে। এলেনা ভাবছিল প্রমোদ নিশ্চয় টাকা দিয়ে দেবে, নইলে ওর ঘাড়ের ওপর খাঁড়া।

এলেনাই শুরু করল, 'ওরা কোনও ডেডলাইন দেয়নি। এক কাজ করো। মোবাইল সুইচ-অফ করে হাওয়া হয়ে যাও। সবাইকে বলে দাও শোক ভুলতে বাইরে যাচ্ছ। নতুন সিম নাও। জিপিএস বন্ধ রাখ। সময় গেলেই সবাই ভুলে যাবে। হতেই পারে যে ফোন করেছিল সে এই ডিলের কেউ নয়। যদি তাই হয় ডয়েশ ব্যাঙ্কে রিফাণ্ড চাইত। ওই ব্যাঙ্ক থেকেই ট্রান্সফার হয়েছিল। হতেই পারে যে খুন করেছে তারই কারসাজি।'

ওর কথা শোনাই ভালো। যথেষ্টই বিচক্ষণ। চাইলে বাবার এমন এক বাড়িতে হাওয়া হয়ে যেতে পারে যার হদিশ কেবল ও-ই জানে। বাবার গা ঢাকা দেওয়ার আস্তানা। সে ছাড়া ওই ভিলার কথা আর কেউ জানে না।

বেরিয়ে যাওয়ার আগে এলেনা বলল, 'এখুনি ফোনটা সুইচ অফ করে দাও। সমস্ত টেক্সট কলও ব্লক করে দাও। ঝামেলায় পড়লে তোমার অজুহাত রইল। নতুন যে প্রিপেড সিম নেবে সাবধানে রেখ।'

তা-ই করবে। এখন থেকে প্রমোদ কারাতের অস্তিত্ব কর্পূরের মতো ধোঁয়ায়।

***

আলঘানিম মুজিবুর রহমানকে খেঁকিয়ে উঠল, 'ওখানে কেন আগে না জেনেই খুনটা করলে?'

মুজিবর বোঝাবার চেষ্টা করল, 'উপায় ছিল না। বেনারসই একমাত্র ভিড়ের জায়গা যেখানে অলক্ষ্যে কাজটা সেরে পালাতে পারি। অন্য কোথাও হলে ট্র্যাক করে ফেলত। খুনটা যেভাবে হয়েছে তার জন্যে ক্রেডিট দিন। হলুদ করবীর বীজে বিষক্রিয়ার সিম্পটম হার্ট অ্যাটাকের মতো। কে বুঝবে?'

'যে কোথাও এটা হতে পারত।' আলঘানিমকে বোঝানো সহজ নয়।

'হতে পারে। যেহেতু আমি সঙ্গে, আমার দিকে নজর পড়তই।'

আলঘানিম খ্যাঁক করে উঠল, 'এই নোটবুকের ডেটাবেসে কম করেও ১০০০ নাম।'

'আশাই করা যায়। লোকটার প্রচুর পরিচয়। গ্লোবাল এজেন্ট। নেটওয়ার্কও বিশাল হওয়ারই কথা।'

'ড্রাগ ডিলার থেকে অস্ত্রের কারবারি, কে নেই!'

'এসব নেটওয়ার্ক এভাবেই কাজ করে। ওরা অ্যাসিস্ট করে।'

'কী জন্যে ভারতে গেছিল কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা মাথা খুঁড়েও আঁচ করতে পারছে না। তেলের খনিতে বিস্ফোরণের পর এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। তেলের দাম আকাশছোঁয়া। মার্কিন অর্থনীতি ধ্বসের দিকে। বিশ্বে আধিপত্য হারাতে বসেছি।'

'কাউকে সন্দেহ?'

'আলাদা করে অসম্ভব। কিছু ফোল্ডার পাওয়া গেছে যেগুলোর পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না। এক্সপার্টরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। মনে হয় ওখানেই আসল ক্লু। ও কি অশোকা হোটেলে কারো সঙ্গে দেখা করেছিল?'

'না।'

বলল না ডেভিড ডালটনকে সন্দেহ। জ্যাক আর ও দুজনেই অ্যামেরিকান। নিজেদের দেশ প্রায়রিটি। ডেভিডই হতে বাধ্য। ভারতে কীসের ডিল? কী বিষয়ে? সিকিমই বা কেন? ওর কি চীনে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল?

মাথায় অনেক কিছু ঘুরপাক খেলেও উত্তর পাচ্ছে না। দুনিয়াজোড়া জালে ঢোকা সহজ হলেও বেরোনো কঠিন। জ্যাক এখনও রহস্যই। শুধু আন্দাজ করা যায়। ওই ফোল্ডারগুলো ক্র্যাক করতে আরও এক্সপার্টদের সাহায্য আবশ্যক।

'এখানেই থাকো। পুলিস কোনও সূত্র পেলে তোমার খোঁজ করবেই।'

মুজিবুর যাওয়ার পর এ নিয়ে বিশ্লেষণে বসল। যদিও ওরা অক্সফোর্ডের দিনগুলো থেকে দারুণ বন্ধু কিন্তু প্রত্যেকের কাছে নিজের দেশই প্রধান। যে যার দেশের উন্নতি চায়। এ বিশ্ব দখলের লড়াই। আরবি দেশগুলোর সম্মেলন ডাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা যায়। দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলোকেও চাই। মুখোমুখি বসেই না হয় গন্ডগোল থাকলেও মিটিয়ে নেওয়া যাবে। এখন দুনিয়া নিয়ে ভাবতে হবে। আগে ফোল্ডারগুলো খোলা জরুরি। তারপর অন্য চিন্তা।

***

অমৃতা ফোনে, 'হান্স গ্রুবার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের প্রাক্তনী।'

লাজবন্তীর জানা ছিল না, 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলটা কী?'

'নিও-মার্ক্সিজমের কেন্দ্রস্থল।'

মার্ক্সিজম সম্পর্কে লাজবন্তী তেমন কিছু জানে না। তাও আবার নিও-মার্ক্সিজম। যদিও ‘দাস ক্যাপিটাল’ পড়েছে। তত্ত্ব বোধগম্য হয়নি।

‘নিও-মার্ক্সিজম কী?’

‘বলতে পারব না’

ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে চাইছে। যা জানা গেল, এর উৎস প্লেটো থেকে। তারপর অগাস্টিন, ডেসকার্ট, লক, হিউম, কান্ট, হেগেলরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে যোগ বিয়োগ করতে করতে অবশেষে কার্ল মার্ক্সের তত্ত্ব। ক্ল্যাসিক্যাল মার্ক্সবাদী দর্শনের নয়া রূপ। নিও-মার্ক্সিজম থেকে পরে ক্রিটিক্যাল থিওরি, সাইকোঅ্যানালিসিস বা অস্তিত্ববাদ চিহ্নিত মার্ক্সীয় দর্শনের পরিচিত রূপ। সমাজতাত্ত্বিক ভাষায় মার্ক্সীয় দর্শনে ম্যাক্স ওয়েবারের সামাজিক অবস্থান, স্ট্যাটাস, ক্ষমতা ইত্যাদি ধারণা নিয়ে।

লাজবন্তী সেনের মাথা গুলিয়ে গেল। পলটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী নয়। তার পক্ষে এসব রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার ফারাক বোঝা কঠিন। এসব ব্যাখ্যামূলক মার্ক্সবাদ, সাংস্কৃতিক মার্ক্সবাদ, পশ্চিমী মার্ক্সবাদ, উত্তর-মার্ক্সবাদ, ওপেন মার্ক্সিজম, মার্ক্সবাদী মানবতাবাদ, তরুণ মার্ক্স, পরিণত মার্ক্স, মার্ক্সবাদেরই বিভিন্ন রূপ। ফারাক বোঝা খুবই কঠিন। যা বুঝল তা হচ্ছে, বিশ্বের নিরিখে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল সোশ্যাল রিসার্চ সেন্টারটা মূলত কার্ল মার্ক্সের তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্রতি। এটা নতুন সংযোজন। হান্স গ্রুবার যদি এই ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তত্ত্বে বিশ্বাস করে, বিষয়টা অত সরল নয়। নিশ্চয়ই বিশ্বের নিরিখে জার্মানির উত্তরণের প্রয়াসী। এটা লাজবন্তীর মাথা ঘামানোর বিষয় নয়। তার চিন্তা হান্স গ্রুবার, আত্রেয়ী আর ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তত্ত্বভাবনার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে।

এসব নিয়ে সিবিআই-ই বরং মাথা ঘামাক। তার ঢের কাজ আছে।

***

বছর কয়েক আগে।

দ্বৈপায়ন দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সে সুযোগ পেল। তার মায়ের সঙ্গে অ্যালবার্ট চৌধুরীর আলাপ ছিল। ছেলের থাকার বন্দোবস্ত যদি করতে পারে এর জন্য মা অ্যালবার্ট চৌধুরীকে অনুরধ করল। মাস্টারস ডিগ্রি পর এলেনা নতুন কাজে ঢুকেছে। মেয়েকে বলতে এলেনাই আস্তানার বন্দোবস্ত করে দেয়। যোগাযোগ বাড়তে ক্রমশ ছেলেটির প্রতি মমতাও জন্মায়। ঝামেলায় পড়লে দ্বৈপায়ন ওর পরামর্শ নিত। অ্যাকাডেমিক সাহায্যও। ফাইন্যাল ইয়ারে কলেজ ফেস্টে আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ থেকে প্রেম। নিয়মিত ওদের আরকে পুরমের বাড়িতে দেখা যেত। আত্রেয়ীর সাহায্যে ওরা দুজনে বহুবার একসঙ্গে বাইরে ঘুরতেও গেছে। প্রেম, আরাম, সুখ, একে অন্যের সান্নিধ্যে। এক নতুন জগৎ। তরুণ দ্বৈপায়ন তখন স্বপ্ন সাগরে ভাসছে। এলেনার সঙ্গে যোগ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু পড়াশোনার বাইরে সময় পেলেই প্রেমিকার কাছে। কতবার বলেছে আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। কিন্তু নানা কারণে বাস্তবে তা হয়ে ওঠেনি।

যখন ফাইনাল পরীক্ষা চলছে, একদিন হতবুদ্ধি দ্বৈপায়ন হাজির, ‘দিদি, ওকে অন্যরকম লাগছে।’

‘কেন?’ এলেনা চমকাল।

‘ঠিক বলতে পারব না। ওর চাল-চলন সুবিধের ঠেকছে না। সম্পর্কটা বোধহয় রাখা যাবে না।’

‘কী হল?’

‘ভারতের বাইরে অচেনা লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ।’

‘ওকে বলেছ?’

‘হ্যাঁ। মানছে না। বুঝতে পারছি না কী করব।’

‘পড়াশোনায় ঢিলে দিও না। পরীক্ষায় মন দাও। হয়ে গেলে কলকাতায় ফিরে যাও। আউট অফ সাইট, আউট অফ মাইন্ড। দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।’

আত্রেয়ী দ্বৈপায়নকে ভুলতে পারেনি।

কলকাতা থেকে এলেনাকে দ্বৈপায়নের পাগলের মতো ফোন, 'এখানেও আসছে।'

এলেনাও ওকে অনুসরণ করল যাতে ঝামেলাটা মেটে। আগেই হোয়াটসঅ্যাপে দ্বৈপায়ন মেয়েটার ফোটো পাঠিয়েছিল। খালি খুঁজে বার করা কোন ফ্লাইটে যাচ্ছে। যদিও ফুল বুকিং, ক্যান্সেলেশনের জন্যে ভাগ্যবলে সিটও পেয়ে গেল। অনেকদিন দেখা হয়নি বলে ইচ্ছে পাঞ্চেত জোংপার সঙ্গেও দেখা করার। চেক-ইনে আত্রেয়ীর পাশেই সিট ম্যানেজ করে। আত্রেয়ী জানলার ধারে, ও মধ্যেখানে, আইলের ধারে আরেক মহিলা।

টেক-অফের পরে কায়দা করে নিজের পরিচয় গোপন করে আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ জমায়। আইলের দিকের মহিলাকে দেখছে। চোখে পড়ার মতো। ঘন্টা দুয়েকের ফ্লাইটে আলাপও জমে যায়।

'কলকাতায় থাকেন?'

'না, দিল্লিতে। আরকে পুরমে।'

'কলকাতায় বেড়াতে?'

'আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করতে।' দ্বৈপায়নের বিষয়টা আত্রেয়ী চেপে গেছে।

এলেনা টয়লেটে। আত্রেয়ী ভাবছে কীভাবে পুনর্মিলন সম্ভব। সে যে ওকে ভালোবাসে। হারানোর কল্পনাতে মনটা হু হু করে ওঠে। ওদের হ্যান্ডব্যাগগুলো ফ্লোরে। কলকাতায় নেমে যে যার ব্যাগ নিয়ে বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরোচ্ছে, হঠাত আত্রেয়ীকে কেউ গুলি করে। হই-হট্টগোল, চার্নক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ফাঁকে কায়দা করে ওর পার্সটা সরিয়ে নেয়।

হোটেল হ্যামিলটনে পৌঁছে পার্সটা খোলে। বিদেশি যোগাযোগের সূত্র খুঁজছে। অবাক বিস্ময়ে দেখে পার্সে আইডি কার্ডটা অন্য কোনও মহিলার। নিশ্চয়ই আত্রেয়ী অন্যের আইডি কার্ড নিয়ে প্লেনে ওঠেনি। এই মহিলাই বা কে? ফোটোর পাশে যার ক্রেডেনশিয়াল, তার নাম জিয়া। যদিও ছবিটা আত্রেয়ীর। অবাক লাগল। দ্বৈপায়নের পাঠানো ফটোর সঙ্গে ছবিটা মেলাল। একই। যদিও নাম আলাদা। প্লেনে কী নামে উঠেছে, আত্রেয়ী না জিয়া? এলেনার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ফ্লাইট বুকিঙের ডিটেল পেলে মেলানো যাবে। কোনও বোর্ডিং পাস বা টিকিট পেল না।

তাহলে কী পার্স বদল হওয়া পাশের মহিলার সঙ্গে? কখন? নিশ্চয় ফ্লাইটেই। কিন্তু অন্য নামে কেন? মনে পড়ল দ্বৈপায়ন বলছিল, 'ওর চাল-চলন অস্বাভাবিক। দেশের বাইরে অচেনা লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ।' ভুল বলেনি। যদ্দুর মনে হচ্ছে সত্যিই যোগাযোগ আছে। কিন্তু জাল পরিচয়ে কেন?

প্লেনের পাশের মহিলার মুখটা ভাবতে চেষ্টা করল। হয়ত তারই। খুনে হতেই পারে। প্রফেশনাল কিলার।

ইন্ডিগো কিছুতেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেবে না। স্বাভাবিক। সে তো আর পুলিস নয়। বাধ্য-বাধকতা নেই। মহিলার সঙ্গে কেন কথা বলেনি ভেবে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়তেও পারত। খুনটা হয়ত আটকানো যেত। এখন দেরি হয়ে গেছে। নিশ্চিত খুনি ওই পাশের সিটের মহিলাই।

সন্ধ্যায় দ্বৈপায়নের সঙ্গে দেখা হতে পরামর্শ দিয়েছিল, 'আত্রেয়ীর কথা ভুলে যাও। ও আর বেঁচে নেই। আজই এয়ারপোর্টে খুন হয়েছে।'

সে-ও এয়ারপোর্টে মহিলা খুনের খবরটা জানে। তবে মহিলা যে আত্রেয়ী তা জানত না। টিভিতেও কোনও ভিডিও ফুটেজ নেই।

'বলেছিলাম না, সুবিধের নয়। এখন তো দেখলে।'

'সত্যিই দেখলাম। প্লেনে ওর পাশেই ছিলাম, যাতে ওর সঙ্গে কথা বলে কিছু আঁচ করতে পারি। আন্দাজ করার আগেই মারা গেল। ঈশ্বর তোমায় বাঁচিয়েছেন। ওকে মাথা থেকে ঝেড়ে কেরিয়ারে মন দাও। অনেক দূর এগোতে হবে দুনিয়ায় নিজের জায়গা করতে।'

ঘন্টাখানেক কথাবার্তা বলে দ্বৈপায়ন চলে গেল। যে কাজে এসেছিল সেটা এভাবে শেষ। সময় নষ্ট না করে সকালের ফ্লাইটে সোজা পাঞ্চেতের কাছে। যদিও জানে সম্ভাব্য খুনি কে, তাকে ধরার মতো ক্লু বা লিড নেই। ভারতীয়। হয়ত দিল্লিতেই থাকে। অবশ্য বাইরে থেকে আসতেও পারে আত্রেয়ীকে খুন করার জন্যে।

কিন্তু, কেন?

মাথায় অনেক প্রশ্ন। কোনোটারই উত্তর নেই। বোধহয় পুলিসকে জানিয়ে দেওয়াই ঠিক। কিন্তু পুলিসের সঙ্গে জরাবার আশংকায় পিছিয়ে এল। ফালতু জড়ানোর মানেই হয় না। তেমন হলে ওকেই খুনি বলে সন্দেহভাজনের তালিকায় ফেলে দেবে। তার থেকে পাঞ্চেতের সঙ্গে সময় কাটানোই ভালো।

পরের দিন সকালে বাগডোগরার প্লেনে। পাঞ্চেতই সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে।

***

হান্স গ্রুবারের হদিশ খুঁজতে গিয়ে ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো চমকে উঠল।

নিও-মার্ক্সিজমের তালিম ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের তত্ত্বাব্ধানে। তারা 'ক্রিটিক্যাল থিওরি'-তে আস্থাবান যা মার্ক্সীয় ঘরানাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মার্ক্সবাদের বিবর্তন, ইয়োরোপে নতুন সমাজের ক্ষেত্রে খ্রিস্টিয় মতবাদোত্তর আধুনিকতায় আগ্রহ। ওদের ধারণা নতুন সমাজের ভিৎ প্রস্থাপন। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল নয়া-মার্ক্সবাদী (মার্ক্সবাদের থেকে নৈরাজ্যবাদে) সমাজ ও দর্শনের গবেষণা কেন্দ্র। ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ থেকেই এই ভাবধারার উৎপত্তি। এই মতবাদের সঙ্গে যারা জড়িত বা বিশ্বাসী তাদের চিহ্নিত করতেই শব্দটির ব্যবহার। এর সঙ্গে জার্মানির মুখ্য চিন্তাবিদরা অনেকেই জড়িয়ে।

এই মতবাদের পক্ষে অসন্তুষ্ট মার্ক্সবাদীরাই একত্র, যারা ধনতন্ত্রের কট্টর সমালোচক। প্রচলিত মার্ক্সবাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। মার্ক্সের তত্ত্বের বিশেষ অংশের প্রতিই সমর্থন যার সঙ্গে আধুনিক ধনতন্ত্রের বিবর্তিত রূপের বিরোধ। এর সঙ্গে প্রয়োজন মতো সিগমণ্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বের মতো অন্যান্য ঘরানার তত্ত্বেরও সংমিশ্রণ করেছে। নিৎশে উত্তর-আধুনিক এই তত্ত্বের অন্যতম উদ্গাতা। মার্টিন হেইডেগার অ্যাডলফ হিটলারের আদেশে নিৎশে পড়ে একে 'আধিবিদ্যক মানবতাবাদ' আখ্যা দেয়।

হান্স গ্রুবারের খোঁজে একটি দলের খোঁজ পাওয়া গেল যারা নিৎশের অনুগামী। তাদের বিশ্বাস ইইসির অনুগামী না হয়ে, জার্মানিই দুনিয়াকে নতুন পথ দেখাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানির একনায়কত্বের অবসান। স্মেলঝেইসেন নামে এক ধনী জার্মান ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের আদর্শে এই নয়া মার্ক্সবাদী ঘরানার মুখ্য প্রবক্তা।

ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স বার করতে পারল না আত্রেয়ী কীভাবে এই তত্ত্ব ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে জড়িয়ে। ভারত ইইসি-তে নেই। হান্স গ্রুবারের সঙ্গে আত্রেয়ীর যোগ। সে কেনই বা এতে জড়াল? খুনই বা কেন হল? তার প্রেমিক দ্বৈপায়নই বা এর মধ্যে কোথায়? একই দিনে কেন দুজনকেই খুন? এটা কোনও বিক্ষিপ্ত স্থানীয় ঘটনা নয়। কে বা কারা এর পেছনে বার করতে আরও গভীর তদন্তের প্রয়োজন। বিশ্বের প্রেক্ষিতে ভারতে এই খুনের প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে বার করা ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের বিরাট দায়িত্ব।

***

এলেনাকে দেখে পাঞ্চেত খুশি। অনেকদিন বাদে এল। পরনে থক্রো-দাম আর ইয়েন্থাৎসে, সেই পুরনো পাঞ্চেত। শোবার ঘরে ওর মালপত্র পাঠিয়ে বলল, 'খুব ভালো লাগল। অনেকদিন পর'

'হ্যাঁ। একগুচ্ছ খারাপ খবর নিয়ে।'

'জানি। মেয়েটির মৃত্যুর চেয়েও ওর বন্ধু ছেলেটির মৃত্যু দুঃখের। কাল গুলিতে মারা গেছে' ঠান্ডা গলায় বলল পাঞ্চেত।

'কী!' এলেনা ধাক্কা খেল।

'ওই মেয়েটির প্রেমিক। বোধহয় নাম বলছিলে দ্বৈপায়ন। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর এক মহিলার গুলিতে মারা যায়।'

এলেনার সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ভেবে অবাক যেটা কেউ জানে না এতদূর থেকে পাঞ্চেত জানল কীভাবে? পাঞ্চেত অনুভব করতে পারে যা অন্যরা পারে না। যা কেউ দেখতে পায় না ঠিক দেখতে পায়। প্রচারে নেই, উচ্চাশাও নেই। শুধু ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। অসহায়, বুঝতে পারল যা বলছে, সত্যি। কাঁদতে লাগল।

ওকে একা থাকতে দিয়ে পাঞ্চেত বেরিয়ে গেল। কেঁদে হাল্কা হোক। খুনগুলোর নিশ্চয়ই কারণ আছে। হয়ত একদিন প্রকাশ পাবে। এই মুহূর্তে ভাবার অবস্থায় নেই। শুধু একটু সান্ত্বনা... আবেগকে কী যুক্তি দিয়ে শাসন করা যায়? এটাই জীবনের ধর্ম, রসায়ন।

অসুস্থতা, মৃত্যু, দারিদ্র্য, জরা একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থকে রাজার সিংহাসনের লোভ ছেড়ে রাজা বিম্বিসারের রাজপথে নামিয়েছিল। খুঁজতে বাধ্য করেছিল অস্তিত্বের পেছনের আসল সত্য। শেষমেশ সারনাথে আত্মজ্ঞানের দীক্ষায় সত্যের উপলব্ধি। সময়ই সব দুঃখ নিরাময় করে।

মনাস্টেরিতে বহুক্ষণ নৈঃশব্দ্য। বারান্দায় পাঞ্চেত একা বসে প্রয়াত মানুষগুলোর আত্মার প্রতি নিঃশব্দে প্রার্থনা জানাচ্ছে। পাপও করলেও আত্মা শুদ্ধ, পরিষ্কার। শুধু সামাজিক আবরণ দুনিয়াদারির সঙ্গে রং পাল্টায়।

কয়েক ঘন্টা বাদে এলেনা বেরোল। পাঞ্চেত জোংপা উঠে দাঁড়াল, 'খিদে পেয়েছে?'

'ইচ্ছে নেই।' বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

ওর কাঁধে হাত রাখল, 'পাপের শাস্তি তো হবেই।'

'দ্বৈপায়ন কী পাপ করেছিল?'

'ও করেনি। মেয়েটি। মেয়েটিকে ভালোবাসার মূল্য দিতে হয়েছে।'

'পাপ কোথায়?'

'এ আলোচনার এখন সময় নয়।'

'অপরাধীকে শনাক্ত করতে পেরেছি।'

'কে?'

'ফ্লাইটে যে অন্য মেয়েটা ছিল। পরিচয়ের কোনও সূত্র নেই।'

'ওকে খোঁজা তোমার কাজ নয়। পুলিসের। ওরাই যা করার করুক।' পাঞ্চেত বলল।

'প্রথমে কিছু করব ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম ছেড়ে দেওয়াই ভালো। প্রাণ বার করে দেবে। হয়ত ভাববে আমি খুনির সাগরেদ।'

'সত্যিটা বেরোবেই।' পাঞ্চেত চায়ের জন্যে ভেতরে।

স্মৃতিগুলো শান্তি দিচ্ছে না। মহিলাটিকেও ভুলতে পারছে না। বিশেষ করে যখন জানে সে-ই সম্ভাব্য খুনি।

***

এলেনা বুঝতে পারছিল না কোত্থেকে শুরু করবে।

দিল্লি পুলিসকে বলতেই পারে। তারা ওকে আদৌ গুরুত্ব দেবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ। দুটো খুনই কলকাতায়। পুলিস ওপরমহলের ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। প্রমোদের দিল্লির পুলিসের ওপর মহলে যোগাযোগ থাকতেও পারে।

সব শুনে প্রমোদ বলল, 'পুলিস কমিশনার অমৃতা বেদির সঙ্গে কথা বলতে পারো।'

পুরনো সিম দিয়ে অমৃতার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল।

'কী নাম?' অমৃতা জানতে চাইল।

'আত্রেয়ী ব্যানার্জি।' এলেনার জবাব।

মাথার মধ্যে ঘন্টা বেজে উঠল। লাজবন্তীও এই নামটাই বলছিল। ওর সঙ্গে গ্যেটে ইন্সটিটিউটের হান্স গ্রুবারের যোগ খুঁজছিল। কিন্তু তার প্রেমিক দ্বৈপায়নের সঙ্গে যোগ কোথায়? হতেই পারে খুন দুটোর সঙ্গে হান্স গ্রুবারের যোগাযোগ আছে।

এলেনাকে জানাল, 'কলকাতার আইজি লাজবন্তী সেনের অনুরোধে এই খুনটার তদন্ত করছি। আপনার সন্দেহ পথ দেখাতে পারে। মহিলাটিকে খুঁজতে চেষ্টা করব। ফ্লাইটের ডিটেলস?'

লাজবন্তীর কথাগুলো ভাবতে এলেনাকে কাগজ এগিয়ে দিল, 'যা যা ডিটেল মনে পড়বে লিখে দিন।'

এলেনা যখন লিখতে ব্যস্ত, একটা ছাপা কাগজও এগিয়ে দিল, ‘এই তদন্ত চালাতে চাইলে একটা এফআইআর করতে হবে। দরকারি পয়েন্টগুলো তাতে লিখে দেবেন।’

এলেনা ফর্মে দরকারি ডিটেলগুলো ভরতে থাকল। যেহেতু এলেনা বলেছে ওই ফ্লাইটে আত্রেয়ী সহযাত্রী ছিল, ওর জিনিসপত্রে হদিশ পেতেই পারে। লাজবন্তী বলছে আত্রেয়ীর ব্যাগে দুরকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। একটা যদি ওই মহিলার হয়, যে জিয়া হতে পারে, অন্যটা এলেনার হওয়া অসম্ভব নয়।

‘লাজবন্তী বলছিল আত্রেয়ীর ব্যাগে দুজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। একটা ওর হলে, অন্যটা কার? যাওয়ার আগে আপনার আঙুলের ছাপটা দিয়ে যাবেন।’

এত বছর পুলিসে। কাউকেই সন্দেহের আওতার বাইরে রাখা যায় না। জিয়া যদি সন্দেহভাজন হয়, এলেনাই বা নয় কেন? এলেনাও জানে দ্বিতীয় ছাপগুলো ওরই। ওরা জানার পরে বলতেই হবে কেন ওর আঙুলের ছাপ আত্রেয়ীর ব্যাগে। ভেবে নেওয়ার সময় আছে।

নিজের ডিটেলস দিয়ে এফআইআরে সই করে উঠল, ‘বিশ্বাস করার জন্যে ধন্যবাদ। যা যা জানানো দরকার মনে হল, তাই লিখলাম।’

‘হপ্তাখানেক বাদে আসুন। যোগাযোগের ঠিকানাটা দিয়ে যাবেন। দরকার হলে ডেকে নেব।’

আঙুলের ছাপ, ডিটেল দিয়ে এলেনা বেরিয়ে এল।

***

সেনেটার এডোয়ার্ডস ডেভিড ডালটনকে খিঁচিয়ে উঠল, ‘আরও বিপদ। অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে না পারলে প্রেসিডেন্ট পদের আশাও হাওয়া।’

‘নতুন কী হল?’ ডেভিড বলল।

‘প্রবলেমের পরে প্রবলেম। সুযোগ বুঝে আর্জেন্টিনাও ওদের অপরিশুদ্ধ সোনা রূপোর জন্যে চড়া মুনাফা দাবি করছে।’

‘যদ্দুর জানি ক্লডিওর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ভালো। ও-ই তো আসল লোক।’

‘ক্লডিও সবসময় আমাদের সঙ্গেই। সেই কবে থেকে মেক্সিকোই ধাতু পরিশোধনের মূল ক্ষেত্র। খনি তো পেরু আর বলিভিয়াতে। পরের দিকে ওদের খনি থেকে সোনা রুপো দিয়েছে। ওদের বিরোধিতা করতে চাই না। ক্লডিওর সঙ্গে পেরু আর চিলিরও যোগ আছে। দালাল। অপরিশুদ্ধ ধাতু পরিশোধন করে রপ্তানি করে।’

‘ও কী বলছে?’

‘ও কি ভাবছে, বলছে সেটা কথা নয়। আমাদের সোনা রুপোর সাপ্লাই পেরু আর চিলি থেকে। ক্লডিও মধ্যেখানে থাকায় এতদিন আমাদের রফা মেনেছে। এখন যখন আমাদের অর্থনীতি টালমাটাল, জার্মানির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আমাদের থেকে জার্মানির দক্ষতা কম নয়। দুই পক্ষেরই এই ডিলে কোনও লাভ নেই। রাজনৈতিক ঝামেলাও নেই। সোনার পরিশুদ্ধি দেখভাল জার্মানির হাতে। ওটা হাতে না থাকলে কীভাবে ডলারকে শক্তিশালী করব? বিশ্বের অর্থনীতিকেই বা কী করে আঙুলের ডগায় নাচাব ?’

‘এই জন্যেই ইয়ানাকোচা খনি উড়িয়েছ?’

‘ডেইজি কাটার দিয়ে। জার্মানি সোনার দখল নিলে ডলারের দাম আরও পড়বে। ইন্টেলিজেন্স নতুন খবর এনেছে। ভারত, তিব্বত, চীন সহ গোটা উত্তরপূর্ব এলাকায় ভূমিকম্পের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। স্যাটেলাইটে দেখা যাচ্ছে হিমালয় অঞ্চলে ভূমিকম্পের জেরে নতুন সোনার উৎস। এলাকাটা ভারত আর চীনের দখলে। ইন্টেলিজেন্স এর গুরুত্ব বিচার করতে স্যাটেলাইটের ছবি যাচাই করছে। যদি সত্যি হয় ভারত আর চীন বিশ্ব জুড়ে বড় শক্তি হয়ে উঠতে চলেছে।’

নতুন এ খবরটা ডেভিড জানত না। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে অবস্থাটা ঠিক কেমন অক্সফোর্ডের অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে আঁচ করতে হবে। এরকম হলে, নিজের দেশকে বাঁচাতে হবে। আলদাভাবে

কাজ না করে, একত্রিত হয়ে। না হলে সামাল দেওয়া যাবে না। এডোয়ার্ডসকে কিচ্ছু বলল না। সবার সঙ্গে কথাবার্তা হওয়ার পর ঢেকেঢুকে বলা যাবে।

'নিজেদের শক্তি বজায় রাখতে অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদে লাগাম টানতে হবে, যাতে কেউ বেগড়বাই না করে।'

'প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে দাপট দেখাওয়ার জন্যে অর্থনৈতিক রাশ আবশ্যক।'

'আরও কিছু ব্যাপার আছে। আপাতত এটাই প্রধান। কোনোরকম মারামারি, যুদ্ধ ছাড়া অ্যামেরিকানদের আস্থা জয় করতে হলে যেভাবেই হোক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। ইয়োরোপীয় অর্থনীতি আমাদের দিকে তাকিয়ে সমাধানের আশায়।'

সেনেটার এডোয়ার্ডস হয়ত নিজের প্রেসিডেন্ট পদের লক্ষ্য অন্যান্য রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কথা চালিয়েই যেত। ডেভিডের ইহুদি মানসিকতা অর্থনীতিটা ভালো বোঝে। সেনেটার যখন দখল বজায় রাখার রাজনৈতিক দিক নিয়ে চিন্তিত, ডেভিড ভাবছে কীভাবে এই পাক থেকে বেরোনো যায়।

ভূমিকম্পের খবর পেলেও সোনা ঠিক কোথায় তার স্যাটেলাইট লোকেশন জানা নেই। অন্যের সম্পদে হানা দেওয়ার চেয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসাই ভালো। এটাই জ্যাক হ্যামিলটনকে ভারতে পাঠানোর মূল কারণ। আবিষ্কৃত সোনার খনির হদিশ। বোঝা যাচ্ছে না কেন বারাণসী গেছিল। মারা যাওয়া পর সবই হাতের বাইরে।

এই মুহূর্তে ভারতের রাজনীতি অশান্ত। এটাই ওখানকার ভবিষ্যৎ শাসকদের ওপর থাবা বসানোর মোক্ষম সময়। মনিটর করতে হবে তারা যাতে ক্ষমতায় আসে। তাই বিনোদ কারাত। মার্ক হেনলি পাঁচশো মিলিয়ন সুইশ ফ্রাঁ তাই ওর সুইশ অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছিল। বিনোদ যদি প্রধানমন্ত্রী হয় তাকে ওর সুতোর টানে নাচাতে পারবে। কেন খুন হল সেটাই রহস্য। নিশ্চয় আড়ালে অন্য কেউ। কে সে?

উঠে সেনেটরের দিকে তাকাল, 'তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। সময় দিন। দেখা যাক কী করতে পারি।'

সেনেটর এডোয়ার্ডস হাসল, 'তোমার ওপর আস্থা আছে। বিস্ফোরণের সিদ্ধান্তটা প্রেসিডেন্টের অফিস থেকেই।'

ডেভিড উত্তর দিল না। তাকে অন্যান্য অ্যামেরিকান-ইহুদিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনে হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্তটা নেওয়া। যদি একে-অন্যের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করতে থাকে এক সময় শূন্যতা তৈরি হতে বাধ্য। সেই ফাঁকে অন্যরা ঢুকে পড়ে পরিস্থিতির দখল নেবে। ভারত আর চীনের মধ্যে দূরত্ব বেশি না। সেটা আরও অর্থনৈতিক বিপর্যয় আনতে বাধ্য।

ঠিক করল ক্লডিওকে ফোন করে ক্ষতি সামাল দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

***

এক সপ্তাহ বাদে অমৃতার ফোন, 'ফ্রি থাকলে আমার অফিসে একটু আসেন'

'নিশ্চয়ই।' এলেনা সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

বিকেলে এলেনার সঙ্গে অমৃতার দেখা, 'কফি?'

'নিশ্চয়ই। সারাদিন খুব চাপ গেছে।'

ইতিমধ্যে অমৃতা জেনেছে আত্রেয়ীর ব্যাগে যে আঙুলের ছাপগুলো তার একটা এলেনার। মেয়েটাকে যতটা সহজ মনে হয় ততটা নয়। এখন পুলিসের নজরে। লাজবন্তীর সঙ্গেও কথা বলেছে। অন্য আঙুলের ছাপটা চিহ্নিত করতে ব্যস্ত। হতে পারে, এলেনা যে মহিলার কথা বলছে, তারই। টার্মিনাস থেকে বেরোবার সময়ে এলেনাই আত্রেয়ীর কাছে ছিল। অন্যের নজর এড়িয়ে গুলি করেও থাকতে পারে। নামটা বিদেশি ঘেঁষা। বিদেশি যোগ থাকতেও পারে।

অমৃতা কফিতে চুমুক দিল, ‘আপনার মহিলা সহযাত্রী অ্যামেলিয়া সিদ্দিকি। মুম্বইয়ে বান্দ্রা রিক্ল্যামেশনের বাসিন্দা।’

কৌতূহলে এলেনা জানতে চাইল, ‘দিল্লি থেকে কেন প্লেন ধরল?’

‘বলতে পারব না। মুম্বইয়ের দামি মডেল। হয়ত দিল্লিতে কাজে এসেছিল। বান্দ্রার ফ্ল্যাটে ওকে পাওয়া যায়নি।’

এলেনার বিশ্বাস হল না এই অ্যামেলিয়া মহিলাটি মডেলিং-এর কাজে দিল্লি এসেছিল। বোঝাই যাচ্ছে অমৃতা ওকে বিশ্বাস করছে না। খুন দুটোর সঙ্গে নিশ্চয়ই অ্যামেলিয়ার যোগ আছে। ওর দিল্লি-কলকাতা ট্রিপগুলো তলিয়ে দেখা দরকার। ব্যাখ্যা চাই। ধোপে টেকার আগে মেনে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা সামাজিক বাহ্যিক পরিচয় থাকে। ভেতরের সত্ত্বা নিয়ে মানুষ কমই মাথা ঘামায়, যদিও সেটাই অনেক সময় তাদের কাজকর্মের পেছনে সক্রিয়। অনেকটা ক্যানভাসের মতো যেখানে একজন অন্ধ লোক তার অন্তঃসত্ত্বাকে অনুসন্ধান করছে। চাইছে বড় ক্যানভাসটাতে পৌঁছতে। কেবল অন্ধের মতো নয়, যুক্তিবাদী কৌতূহলী মন নিয়ে।

অমৃতা টেবলের ওপর দিয়ে অ্যামেলিয়ার ছবিটা ঠেলে দিল, ‘দেখুন তো, এই মহিলা কী আপনার সঙ্গে ফ্লাইটে ছিল?’

‘হ্যাঁ’, এলেনা মাথা নাড়ল।

‘অ্যামেলিয়া সিদ্দিকি সঙ্গে প্লেনে থাকলেও কীভাবে খুনের সঙ্গে জড়িত ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘যৌক্তিকভাবে মনে হচ্ছে এ-ই সেই লোক। যতক্ষণ না আপনি ওর পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে পারছেন বুঝতে পারবেন না।’

‘সন্দেহের ওপর তো তদন্তে নামা যায় না। প্রমাণ চাই’

এলেনার হাতে কিছুই নেই। প্রমাণ ছাড়া যুক্তিকে দাঁড় করাতে পারবে না। পুলিসের লোক হিসেবে অমৃতার পক্ষে ওকে বিশ্বাস করা কঠিন।

‘ওকে কেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?’

‘হয়ত কোনও অ্যাসাইনমেন্টে।’

‘মোবাইল সুইচড অফ। ব্যস্ত নামী মডেলের মোবাইল বন্ধ। ভাবা যাচ্ছে না। প্রফেশনাল কোলিগরাও খোঁজ জানে না?’

এলেনার যুক্তি উড়িয়ে দেওয়ার নয়। প্রমাণ ছাড়া, কেবল সন্দেহের ওপর দাঁড়িয়ে সরকারি জায়গা থেকে অমৃতা কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে না। এক ফ্লাইটে, এ দিয়ে খুনী প্রমাণ অসম্ভব। লাজবন্তীর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

অমৃতার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন বুঝে এলেনা বলল, ‘ওর ফোটোটা রাখতে পারি? কন্ট্যাক্ট ডিটেলসও’

অমৃতা হাসল, ‘নিশ্চয়। কদ্দুর কী হবে জানি না। যদি তেমন কিছু জানতে পারেন, জানাবেন।’

পুলিস এভাবেই জাল ফেলে মাছ ধরে। এলেনা জানে না অমৃতা ওর ওপর কড়া নজর রাখার বন্দোবস্ত করেছে। অমৃতার ধারণা খুনি এদের দুজনের মধ্যে কেউ কিংবা একসঙ্গেও হতে পারে। যদি তাই হয় আরও তদন্ত দরকার।

‘বললেন না তো কীভাবে আপনার আঙুলের ছাপ আত্রেয়ীর ব্যাগে।’ অমৃতা জানতে চাইল।

‘হতেই পারে। টেক-অফের সময় ওটা পায়ের কাছে গড়িয়ে এসেছিল। তুলে দেওয়ার সময় হবে’ এলেনা উঠে দাঁড়াল, ‘ধন্যবাদ। অনেক হেল্প করলেন। কিছু পেলে নিশ্চয় জানাব।’

মনে মনে প্রমোদকে ধন্যবাদ দিল। সে না থাকলে যোগাযোগটা হত না। সহযাত্রীর হদিশ এখন হাতে। কেবল মাথায় ঢুকছে না, আত্রেয়ীকে কেন কেউ জিয়া বলে হাওয়া করে দেবে। এটাই প্রমাণ করতে,

আত্রেয়ীই নিজের পরিচয় লুকিয়ে জিয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন? মাথামুন্ডু মাথায় ঢুকছে না। অন্যদিকে অ্যামেলিয়াকে জিয়া বলে চালানো অসম্ভব কারণ ও নিজের নামেই প্লেনে উঠেছিল। সবই কেমন গোলমেলে।

জিয়াকে না পাওয়া গেলে অ্যামেলিয়াকেও খুনি প্রমাণ করা কঠিন। একমাত্র কেউ যদি জিয়াকে সনাক্ত না করে।

এতসব ধাঁধা মাথায় নিয়ে বেরোল। পুরোদমে মাথা কাজ করছে।

***

ফের ওরা মুখোমুখি।

'থান্ডার লাইটনিং রেনে' নয়, ক্রেমলিন রেড স্কোয়ারের কাছে রিজ-কার্লটন হোটেলের ২৫০০ বর্গ ফিট রিজ-কার্লটন স্যুটের বোর্ডরুমে। এবার আগের মতো অক্সফোর্ড প্রাক্তনিদের রিইউনিয়ন নয়। বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে সিরিয়াস আলোচনা। ডেভিড ডালটন সবাইকে বুঝিয়েছে মতের অমিল ঘুচিয়ে এককাট্টা না হলে টিকে থাকা কঠিন।

গোয়েন্দা দপ্তর জানিয়েছে উত্তর-পূর্বে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর, হিমালয় অঞ্চলের ভূগর্ভে বিপুল সোনার খনির কথা। স্যাটেলাইট বলছে এর ৭০ শতাংশই ভারতীয় উপমহাদেশে আর বাকি ৩০ শতাংশ চীনে। এর মানে ভারত বা চীন কেউই বিশ্ব-অর্থনীতিতে একা ছড়ি ঘোরাতে পারবে না।

রাশো-বালটিক ভডকায় চুমুক দিয়ে ডেভিড বলল, 'মত বিরোধ ভুলে যাও। হাতে হাত মিলিয়ে ওই সোনার দখল নিতে হবে।'

'কী করে?' মার্ক জানতে চাইল।

'সেটাই এ মিটিংয়ে ঠিক করতে হবে। ভারতে যতই রাজনৈতিক দুর্নীতি থাক, অন্য কোনও দেশকে ওতে থাবা বসাতে দেবে না'

'চীনও দেবে না' আলঘানিম বলল।

'তাহলে?' রেইনার জিজ্ঞেস করল।

'একমাত্র উপায় উত্তর-পূর্ব ভারতে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা। দুটো দেশই যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের সদস্য, ইউএন ব্যানারকেও জড়িয়ে নিলে ভালো।'

'করাই যায়। তাতে কিচ্ছু লাভ হবে না। ভারত বা চীন কেউই খবরটা ভাঙবে না' আলঘানিম রাশো-বাল্টিক ভডকায় চুমুক দিয়ে সরাসরি মূল বিষয়ে, 'রাশিয়ান ভডকাটা আমার পোষায় না। স্কচই প্রেফার করি।'

রুটিন অনুযায়ী সিওপিডির ওষুধগুলো বার করে টেবলে রাখে যাতে পরে ভুলে না যায়। ডেভিড মার্ক দুজনেই লক্ষ্য করল সাদা লম্বা ওষুধগুলো স্পিরিভা ১৮। ডেভিডের ওদিকে খেয়াল নেই। মাথায় ঘুরছে স্যাটেলাইটে সোনার হদিশ। কীভাবে ওটা হাতানো যায় বার করতে হবে। মার্ক নামটা নোট করল। কোনটা কখন কীভাবে কাজে লেগে যায়, কে জানে?

আলঘানিম জানে চীন অন্তর্দেশীয় ব্যাপারে গোপনে পা ফেলে। মন্ত সে তুং ভালোভাবেই সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

'একমাত্র উপায় ভারতীয় কোনও হাই-প্রোফাইল নেতাকে হাত করা।' মার্ক বলল।

'ভারতের উঁচু তলার নেতারাও এই সোনা আবিষ্কারের খবরটা জানে না। র-এর গোয়েন্দা রিপোর্ট সোজা ডিফেন্স মিনিস্ট্রি হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চলে যায়। র-কে হাত করা সহজ নয়।'

'একমাত্র উপায় দু-দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া।' ডেভিড মার্কিন স্ট্র্যাটেজিস্ট কায়দায় যোগ করল।

'সফলও হলেও লাভ হবে কী?' রেইনার পরামর্শ দিল, 'তার থেকে অফিসিয়ালি ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে যাওয়াই ভালো। ক্রিম ছাড়া আইসক্রিম দেওয়া।'

'কীভাবে?'

‘ভারতে রাজনৈতিক ডামাডোল লেগেই আছে। শেয়ার মার্কেট থেকে আমরা সরে এলেই মন্দা শুরু হয়ে যাবে। সেই ক্রাইসিসের সময়ে ইনভেস্টমেন্টের প্রতিশ্রুতি দেওয়া।’

‘রেইনার খারাপ বলেনি। শুধু ইনভেস্টমেন্টের প্রতিশ্রুতি দিলেই কাজ হয়ে যাবে। প্রতিশ্রুতি মানে ইনভেস্টমেন্ট নয়। ঠিক সময়ে সরে আসা যাবে।’ ডেভিড বলল, ‘ডিসিশন হলে আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। না হলেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে।’

ডেভিডের ব্যাপারে আলঘানিমের যথেষ্ট সন্দেহ। ঘাওয়ার অয়েল ফিল্ড আর ওরিনোকো টার স্যান্ডসের বিরাট বিস্ফোরণের পরে সন্দেহটা আরও বেড়েছে। এসব মার্কিনিগুলো ওদের তেলের ভাণ্ডার নষ্ট করে দিচ্ছে। ডেভিডকেও ধর্তব্যে আনে না। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ওপর ওপর, নিরপেক্ষ। যদি প্ল্যান কাজও করে, মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর বাড়তি কী লাভ? যদিও বন্ধু, এসব অ্যাংলো-স্যাক্সনদের ওপর কোনও বিশ্বাস নেই। অর্থনৈতিক লাভের জন্যে ফালতু ইস্যু খাড়া করে বহুবার মধ্যপ্রাচ্য আর আফ্রিকায় যুদ্ধ বাধিয়েছে। হাত মেলালেও এই ডিল থেকে লাভের আশা নেই। তাদের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ সোনা নয়। লোহা, তামা বা অন্যান্য ধাতুর চেয়ে সোনার কী আলাদা মূল্য? সোনার দাম বাড়া কমা বাজারের খেল। অর্থনৈতিক বাজারে আলাদা করে তার গুরুত্ব বাড়ানো হয়েছে। বরং তেল অনেক বেশি জরুরি। শক্তির উৎস। প্রয়োজনীয়তা আছে। সোনার কী আছে? সে জানে, ইরাকে সম্প্রতি বিরাট তেলের খনির সন্ধান মিলেছে। যদি তাই হয়, অ্যামেরিকাকে গুরুত্ব দিতে রাজি। ওদের প্ল্যানের বিরুদ্ধে গেলে ক্ষতি। হঠকারি পদক্ষেপ হয়ে যাবে। নিজের সুবিধের জন্যেই ওদের সঙ্গে লেগে থাকতে হবে।

রেইনার চুপ ছিল। সেও নিও-মার্ক্সিস্ট জায়গা থেকে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের বিরুদ্ধে। বরং নিজের দেশের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারে উৎসাহী। রাষ্ট্রসংঘ থেকে উত্তরপূর্বে আন্তর্জাতিক সামিটে তারও কোনও লাভ নেই।

এদের কারোরই নিজেদের দেশের রাজনীতিতে সরাসরি হাত নেই। যদিও প্রত্যেকেই ধনী ক্ষমতাশালী, তবু কারোরই কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ব্যাপারে হাত নেই। প্রত্যেকটা দেশেরই নিজস্ব লক্ষ্য রয়েছে। প্রত্যেকেই চায় কর্তৃত্ব। নানা রকম পলিসি নিচ্ছে যাতে তারা দেশে ক্ষমতা পায়। সেই সূত্রে বিশ্বে ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। মানুষের মন নানান স্ববিরোধী গোলকধাঁধার আবর্তে। সবাইকে এক জায়গায় আনা কঠিন। নিজেদের লক্ষ্য পূরণের টোপ গিলিয়ে ভারতে এরকম একটা সামিট ডাকা খুব খারাপ পরিকল্পনা নয়।

‘ভডকাতেই অনেক ডায়লগ হল। রুশ মেয়েরা কোথায়?’ রেইনার হাসিমুখে তাকাল।

ডেভিডকে দেখে বোঝা মুস্কিল, সিরিয়াস না হাল্কা মুডে। ওর মুখ দেখে রেইনার কী করবে ভেবে পেল না। ডেভিড শেষে মুখ খুলল, ‘তাহলে সবাই রাজি?’

‘নিশ্চয়ই।’ আলঘানিম বলল। যদিও মুখ দেখে মনে হয় না সবাই একমত।

মিটিঙে যে কথা হয় সবটাই যে সব সময়ে কার্যকরী হবে এমন নয়।

‘যাক। এবার একবার পুরনো কলেজের দিনে ফেরা যাক। ক্রেমলিনে এসে রাশিয়ান ব্যালে না দেখাটা বোকামো। এখানে কিছু করা যায়?’

‘নিশ্চয়ই। টাকা থাকলে মেয়ের অভাব?’

আলঘানিম হাঁহাঁ করে উঠল, ‘একদল রাশিয়ান ব্যালেতে। অন্য দল কিন্তু নিজের মতো করে সম্ভোগের সুখে।’

‘ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলব?’ ডেভিড বলল।

মার্ক চুপ। এক ঘন্টা পরে ব্যালে ডান্সারদের প্রবেশ। শেষ হতে শয্যাসঙ্গিনী অন্য দল।

***

এলেনার মনে হচ্ছিল কেউ তাকে ফলো করছে। কে? অ্যামেলিয়ার দলের কেউ, না কি পুলিসের কোনও লোক?

অমৃতার মুখচোখই বলে দিয়েছে ও এলেনাকে বিশ্বাস করেনি। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে ওকে অ্যামেলিয়া সিদ্দিকিকে খুঁজে বার করতে হবে। তাহলেই এই জোড়া খুনের রহস্যের উন্মোচন সম্ভব। সে নির্দোষ তা-ও প্রমাণ হয়ে যাবে। মোবাইল থেকে অ্যামেলিয়াকে ধরতে চেষ্টা করল। সুইচড অফ। এভাবে মোবাইল বন্ধ রেখে কী ভাবে পেশায় টিকতে পারে? ওর ঠিক নম্বরটা দিয়েছে তো? জানতে হলে মহিলার মুখোমুখি হতে হবে। না হলে এই রহস্যের তল পাওয়া যাবে না।

তাকে অনুসরণ করা হবে মাথায় রেখেই মুম্বইয়ের ফ্লাইটের টিকিট বুক করল। যদি পেছনে পুলিসের লোকই লাগে, তারা তো গায়ে হাত দেবে না।

গিয়ে দেখল বান্দ্রা রিক্ল্যামেশনে অ্যামেলিয়ার ফ্ল্যাটে তালা। প্রতিবেশীরা লক্ষ করেছে কোথাও বেরিয়ে গেছে। যোগাযোগের অন্য কোনও রাস্তা বাৎলাতে পারল না।

'কেউ কী ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?'

পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী বলল, 'বলতে পারব না। যখন তখন আসে, বেরিয়ে যায়, কারও সঙ্গে মেশে না। কী করে জানব? হপ্তাখানেক আগে পুলিস খোঁজ করছিল। আপনি বুঝি আত্মীয়'

'কেন বলুন তো?' এলেনা জিগ্যেস করল।

'এমনিই কৌতূহল। কেউ তো এত কিছু জানতে চায় না। যারা ওর কাছে আসে তাদের আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে। যখনি লোক এসেছে, দেখেছি বাড়িতে।'

'পুরুষরাই বুঝি?'

'তাই মনে হয়। এখানে অনেকেই থাকে। কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না।'

এলেনা বিকেলের ফ্লাইটে মুম্বই ছাড়ল। কাল অনেক কাজ। মুম্বাইতে তেমন কেউ চেনা নেই যে ওকে অ্যামেলিয়ার খবর দিতে পারে। নিঃসন্দেহ মেয়েটা সুবিধের নয়। যদি আত্রেয়ীকে মারতে মুম্বাই ছেড়ে থাকে শিগগিরি ফেরার আশা কম। নামী মডেল। কদ্দিন এভাবে গা ঢাকা দেবে? হয়ত মডেলিং মূল পেশা নয়। একটা আড়াল মাত্র। আসল কাজ কী? ভাড়াটে খুনি? তা-ই যদি হয়, কাদের হয়ে কাজ করে?

দিল্লিতে ফিরে মাথায় বেশ কয়েকটা প্রশ্ন, যার কোনও জবাব নেই। বেশি রাতে বাড়ি ফিরে দেখে ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে অপরিচিত একটা গাড়ি পার্ক করা। নিশ্চিত কেউ তাকে অনুসরণ করছে। কে? হয় পুলিস নয়ত এই জোড়া খুনের সঙ্গে জড়িত কেউ। হিমশীতল একটা স্রোত মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল। যদি পুলিস হয় জীবনের আশঙ্কা নেই। নইলে সে-ও এদের শিকার হতে পারে।

একবার ভাবল পাঞ্চেত জোংপার কাছে উধাও হয়ে যায়। সেখানেও তো এরা হাজির হতে পারে।

***

অমৃতা এলেনাকে অ্যামেলিয়ার আসল পরিচয় দেয়নি কেন না এলানাও অন্যতম সন্দেহভাজন। তাছাড়া তার কাছে প্রমাণও নেই যে এসব খুনের সঙ্গে অ্যামেলিয়া জড়িত। যে ছদ্মবেশী সিবিআই অফিসারকে কাজে লাগিয়েছে সেই এলেনার মুম্বই যাওয়ার কথা জানিয়েছে। লাজবন্তীকেও এই তদন্তে জড়াতে হবে।

সব শুনে লাজবন্তী বলল, 'মনে হচ্ছে এর সঙ্গে আরেকটা খুনকেও জড়িয়ে নিতে হবে। রিয়া সম্বন্ধে বলিনি। ওকেও খুন করা হয়েছে এখানের একটা ফ্ল্যাটে, গলায় ফাঁস দিয়ে। তদন্তে দেখা গেছে দিল্লির কেউ ভুয়ো নামে ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিল। কে খুন করল এখনও ধরা যায়নি। মনে হচ্ছে ওই দুটো খুনের সঙ্গে এটারও কোনও যোগ আছে। অ্যামেলিয়া সিদ্দিকিকে পেয়েছ?'

'না। মুম্বইতে ওর হদিশ মেলেনি।'

'ওর এজেন্সিতে খোঁজ নিয়েছ?' লাজবন্তী জানতে চাইল।

‘না, এখনো নেওয়া হয়নি। মুম্বই আমার এলাকার মধ্যে পড়ে না। কিছু করতে গেলে আইজি মুম্বইকেও সঙ্গে নিতে হবে।’

আনন্দ দেশমুখ, আইজি মুম্বই। তদন্তের পর তার কাছ থেকে এক নতুন তথ্য মিলল। সে জানাল, ‘অ্যামেলিয়া সিদ্দিকির খবর পাওয়া গেছে। নামি মডেল। ওর বাবা মহম্মদ সিদ্দিকি এখানেই থাকত। হায়ার স্টাডিসের জন্যে জার্মানি যায়। সেখানে সাব্রিনার সঙ্গে আলাপ। অ্যামেলিয়া ওদেরই সন্তান। মহম্মদ সিদ্দিকি ডুসেল্ডর্ফ ইউনিভার্সিটির ইন্ডোলজির অধ্যাপক। অ্যামেলিয়ার প্রাথমিক পড়াশোনা ডুসেল্ডর্ফে। গ্র্যাজুয়েশনের পর এখানে মডেলিং শুরু করে। যেহেতু মিক্সড অরিজিন, চামড়ার রঙের জন্যে ওর মনে হয় মুম্বইতেই কেরিয়ার শুরু করলে লাভ। নাম হয়ও। ওর এজেন্টও এখন কোনও খবর জানে না।’

অমৃতা জানতে চাইল, ‘ওর মডেলিং চলছে কী করে?’

‘অত্যাধিক পরিশ্রমের পর এক মাসের ছুটির কথা এজেন্টকে বলে গেছে। ক্লায়েন্টদেরও এজেন্ট তা জানিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত ছুটিতে এখন বাবা-মার কাছে ডুসেল্ডর্ফেই।’

আনন্দর ধারণা ঠিক নয়। দিল্লি থেকে ফ্লাইট ধরে। ডুসেল্ডর্ফে নয়, লোকচক্ষুর আড়ালে দেশেই কোথাও আত্মগোপন করেছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে চেক করতে জানা গেল অ্যামেলিয়া বাবা-মার কাছে যায়নি।

অমৃতা দমে গেল। যদি ভারতেই থাকে, তাহলে কোথায়? লুকিয়েই বা কেন? এলেনা যদি ঠিক হয়, কলকাতা থেকে কোথায় গেল? খুনগুলোর সঙ্গে আদৌ সম্পর্ক আছে কি না যেখানে ধোঁয়াশা, না জেনে ওর পেছনে ছোটা সরকারের টাকার অপচয়।

তার থেকে এলেনাকেই বাজিয়ে দেখা যাক। ওর পেছনে ঘুরে কিছু বেরোলে তখন অ্যামেলিয়ার পেছনে দৌড়নো যাবে। এলেনাই এখন সন্দেহের কেন্দ্রবিন্দু। এলেনার ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দিল।

***

ক্রেমলিন থেকে ফিরে আলঘানিম ভেবেছিল উত্তাপ হয়ত কমবে। মুজিবর রহমানের ভারতে ফেরাই ভালো। ওখানে আসন্ন ইউএন সামিটে সাহায্য করতে পারবে। যদিও ডেভিডই সম্মেলনটার আয়োজন করেছে, আলঘানিমও ওর থেকে মধ্য প্রাচ্যের কিছু ফায়দা বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়। পরিকল্পনা মাফিক আলঘানিমের কথামতো মুজিবর ভারতে ফেরে সেই কাজে। যেহেতু ইইসি-র মধ্যেই অর্থনৈতিক নীতিতে মতপার্থক্য, এটাই সময়। নিজেদের মধ্যে বখেরা মেটাতে যখন ব্যস্ত, সেই ফাঁকে নিজেরটা গুছিয়ে নাও।

দক্ষ কম্পিউটার হ্যাকারদের কাজে লাগিয়েছে জ্যাক হ্যামিলটনের নোটবুকের এনক্রিপ্টেড ফাইলগুলো ডিকোড করতে। অনেক চেষ্টায় ওরা সেগুলো ক্র্যাক করেছে। ডেভিড ডালটন যে জ্যাককে ভারতীয় মন্ত্রিসভার উচ্চপদস্থ লোকেদের সঙ্গে চুক্তি করতে ভালো টাকা দেবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মার্কিন অর্থনীতি এখন টলমল। যদি মধ্য-প্রাচ্যে একটা যুদ্ধ না বাধাতে পারে ওদের পক্ষে অস্ত্র বিক্রি করে বেহাল অর্থনীতিকে ফেরনো সম্ভব নয়। ভারতের সস্তা শ্রমিকদের কাজে লাগানোরও অন্য পরিকল্পনা। যে কোনও মূল্যে সদ্য উঠে আসা ভারতীয় শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধাই লক্ষ। অ্যামেরিকার হয়ে জাল ছড়ানোয় জ্যাকের ওপর নির্ভরশীল।

যথার্থ। যে কোনও দেশই নিজের স্বার্থে এরকম ঢুকতে চাইবে।

তবে তার জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

জ্যাক হ্যামিলটনের সঙ্গে র আর চীনের সরকারেরও যোগাযোগ ছিল। জ্যাক তাহলে ট্রিপল এজেন্টের কাজ করছিল। মুজিবরকে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপারে যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, স্রেফ মুখোশ মাত্র। অ্যামেরিকার হয়ে কাজ করার পাশাপাশি ইন্দো-টিবেটান-চাইনিজ সংঘাত মেটাবার ব্যাপারেও মধ্যস্থতা করছিল। কূট রাজনৈতিক ভূমিকা। এসব থেকে সম্ভবত ডেভিড ডালটনকে আড়ালেই রেখেছিল।

আলঘানিমের হিসেব মতো ভারত আর চীন যদি হাত মেলায় তাদের তেলের একচ্ছত্র আধিপত্য ঝাঁকুনি খেতে বাধ্য। মধ্যপ্রাচ্যের অন্য সব দেশের সঙ্গেও কথা বলেছে। ওরাই যেহেতু তেলের দাম নিয়ন্ত্রণ করে, সবাই বিশ্ব অর্থনীতিকে তাঁবে রাখতে একটা সঙ্ঘ বানাতে আগ্রহী।

জ্যাকের পেছনে মুজিবরকে লাগাবার ব্যাপারে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের চালটাকে বাহাবা দিল। বুদ্ধি করে মুজিবর যে তাকে ঠিক সময় সরিয়ে দিতে পেরেছে এই অনেক।

আড্ডা মদ খাওয়ার জন্যে বন্ধুবান্ধব জরুরি। শক্তির ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের কোনও স্থান নেই। একাই চূড়োয় উঠতে হয়। মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জাগতিক উত্তরণের পাথেয়। সে বাশের, শোলেহ, মালিহেহ, ডেলবার বা ডেভিড, মার্ক, রেইনার যে-ই হোক। যেখানে সিরিয়াস কাজের প্রশ্ন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সচল। যদিও ওর মতলব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না, জ্যাকের মাথায় অন্য কোনও ধান্দা বুঝতে দেরি হয়নি। তার পেছনে ডেভিড ডালটন। তাই ওকে সরানোই শ্রেয়, নইলে ডেভিডের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমস্যা পাকানোর আশংকা। বিশেষ করে যখন তিনমুখো এজেন্ট। এরা হিসেব গুলিয়ে দিতে পারে। সে যথেষ্ট দূরদ্রস্টা। হিমালয় অঞ্চলে ভূমিকম্পর জন্যে সোনার খনি উঠে আসার পরে তো বটেই।

নিঃসন্দেহে বিরাট ধাক্কা ।

ডেভিড যদি ঠিক হয় তাকে একটা ভূমিকা নিতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের আলোচনাসভায় নয়, অন্যত্র। মুজিবরও সেখানে থাকলে ভালো হয়। আলোচনাসভার পর যা হবে মুজিব সামাল দিতে পারবে।

মুম্বইতে ছত্রপতি শিবাজি এয়ারপোর্টে নেমে মুজিবর আলঘানিমের কাছ থেকে পরের কাজের নির্দেশ পেল।

***

ভারত সরকারের কাছে সিকিম আর তিব্বত সংযোগকারী নাথু লা পাসে চীনা সৈন্য মজুতের খবর পৌঁছল। চীন-ভারত সীমান্ত এলাকায় বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের লোক গুলিতে মারা গেছে।

তৎক্ষণাৎ হাই সিকিউরিটি অ্যালার্ট জারি।

২০০৬-এ ব্যবসা আর রুমটেক ও মানস সরোবরের তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে যে নাথু লা পাস চুক্তি হয়েছিল সম্প্রতি কোনও রদ-বদল হয়নি। রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ভারত আর চীনের মধ্যে সাম্প্রতিক কোনও কথাবার্তাও নয়। ইন্দো-টিবেটান বর্ডার ফোর্সের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াল। ভারত সরকারের সন্দেহ হল নিশ্চয় ওই এলাকায় কিছু সমস্যা হয়েছে। মৃত্যু পূর্বে বর্ডার ফোর্স ইন্দো-টিবেটান-চাইনিজ এলাকায় ভূমিকম্পের খবরটা দিয়েছিল। ভারত সরকারের মাথায় ঢুকছিল না খামোকা চীনের দিক থেকে আক্রমণটা কেন। সঙ্গেসঙ্গে ইস্টার্ন কম্যান্ডকে ছানবিন করার নির্দেশ। খতিয়ে না দেখেই পূর্ব বাহিনী চীনের দিকে গুলি চালাল। প্রত্যুত্তরে চীনারাও। চীন-ভারত চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ গোলাগুলি বন্ধ। ইস্টার্ন কম্যান্ড বুঝতে অপারগ কেন আচমকা আক্রমণ আর কেনই বা তা হঠাত বন্ধ। সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সকে জানাতেই জবাব দুই সরকারের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা চলছে।

চীন আন্দাজ করেছিল আচমকা মিসাইল আক্রমণ হলে নতুন আবিষ্কৃত সোনার খনির যোগাযোগের পথ বন্ধ হতে পারে। যেহেতু বেশিরভাগ অংশই ভারতের দিকে, যুদ্ধে জড়ান বোকামি। বরং দু-পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করাই লাভজনক, যাতে উভয়ই প্রকৃতির দানের সুফল পায়। চীন-ভারত বন্ধুত্বে এই আচমকা বাঁক বদলের খবর পেয়ে উভয় দেশের সরকার ঠিক করল সোনার অংশের মালিকানা নিয়ে একটা চুক্তিতে আসা প্রয়োজন। দু-দেশের সরকারের বিদেশ দফতরের মধ্যে অচিরেই একটি আলোচনার ব্যবস্থা হল। গ্যাংটকে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনার আগেই দু-দেশের মধ্যে সোনার মার্কেটিং, ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে একটা চুক্তি হল অত্যন্ত গোপনে যাতে অন্য কোনও দেশ, প্রকৃতির দানের ব্যাপারে নাক না গলাতে পারে।

যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত, চীন আর ভারত দু-দেশই রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনার স্থান অন্যত্র ফেলতে আগ্রহী। আচমকা জায়গা বদল হলে নানা মহলে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। তার চেয়ে আলোচনায় যারা অংশ নবে তাদের ওপর কড়া নজর রাখার সিদ্ধান্ত। এমনকি সিকিম, ভূটান আর তিব্বতের মানুষদের কাছেও এই সোনার আবিষ্কার গোপন করা হয়। দুই দেশই তাদের স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সোনার খনির ওপর কড়া নজর।

সোনা যদি বিশ্ব অর্থনীতির পেছনে মূল ক্ষমতার উৎস দু-দেশই চাইছে প্রকৃতির দান গুছিয়ে সদ্ব্যবহার করতে। এবার তারাই যৌথভাবে বিশ্বের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যা এতদিন অ্যামেরিকা আর উপসাগরীয় দেশগুলি সহ তার মিত্ররা করে এসেছে। বিশ্বের গতিপ্রকৃতি যদি বদলায় অতীত ধ্যান ধারণার ফারাক ভুলে ভবিষ্যতের রাশটা শক্ত হাতে ধরা দরকার।

***

মুম্বই থেকে ৯০ কিমি দূরে, মাথেরানে সুন্দরী এক মহিলার মৃতদেহ আবিষ্কৃত। এলাকার মানুষ অবাক। মাথেরানের পুলিস খবর দিল মুম্বই পুলিস হেড কোয়ার্টারে। ফরেন্সিক সহ একদল পুলিস অফিসারকে মাথেরানে পাঠানো হল মৃত্যুর তদন্তে। মহিলার মুখটা চেনা চেনা।

ধারালো অস্ত্রে কাটা মুণ্ডুটা দেহের পাশেই পড়ে। চারদিকে রক্ত। পুলিস তার পরিচয় বার করার চেষ্টায়। জানা গেল মহিলা এ শহরের বাসিন্দা নয়। ভাড়ার লজে উঠেছিল। সম্ভবত ছুটিতে বেড়াতে এই হিল স্টেশনে।

লজের মালিককে পুলিসের প্রশ্ন, ‘এখানে কদ্দিন ছিলেন?’

‘তিন সপ্তাহ।’

‘নাম?’

‘জিয়া রহমতউল্লা।’

‘ঠিকানা?’

‘কম দিনের জন্যে যারা আসে তাদের কন্ট্যাক্ট ডিটেল রাখা হয় না। এটা হোটেল নয়, প্রাইভেট গেস্ট হাউস।’

‘বিজনেসের লাইসেন্স আছে?’

‘নিশ্চয়ই। দেখবেন?’

‘এখন নয়। একাই এসেছিলেন না কারো সঙ্গে?’

‘একাই।’

‘কেউ দেখা করতে এসেছিল?’

‘বলতে পারব না। এটা টুরিস্ট এলাকা। এখানে যারা আসে সকলের ওপর নজর রাখা সম্ভব নয়।’

যেহেতু মাথেরান ছোট পাহাড়ি শহর এখানকার লোকজনও খুব সজাগ নয়।

লজের মালিক বলল, ‘মাথেরানের একমাত্র ব্যবসা ট্যুরিজম। ট্যুরিস্টদের ওপর কড়া নজর রাখলে কেউ এখানে আসবে না। লোকে দস্তুরি নাকা থেকে মালপত্র নিয়ে ৫/৬ মাইল হেঁটে বা খচ্চরে চেপে আসে। নিরিবিলিতে ছুটি কাটাতে। আমরাও খুব মাথা ঘামাই না।’

‘মৃত্যুটা কী ভাবে আবিষ্কৃত হল?’

‘সকালে ওয়েটার ব্রেকফাস্ট দিতে গেছিল। দরজা খোলেনি। পরে স্থানীয় পুলিসে খবর দেওয়া হয়। তারাই দরজা ভেঙে ঢোকে।’

স্থানীয় থানার ওসি-ও তাই বলল। আশপাশের কেউ বাড়তি খবর দিতে পারল না। মাথেরানের মতো এরকম ট্যুরিস্ট স্পটে কে কখন এল-গেল কেউ নজর রাখে না। বিস্তারিত তদন্তের জন্যে বডি মুম্বই হেড

কোয়ার্টারে পাঠাল। পুনে বা মুম্বই থেকে অধিকাংশ লোক এখানে আসে। মুম্বই থেকে খোঁজ খবর পাওয়া সুবিধেজনক।

মুম্বইর আইজি সিবিআই রাকেশ দেশমুখকে জানিয়ে বডিটা অটপ্সিতে পাঠানো হল। রাকেশ মর্গে বডিটা দেখতে। ফরেন্সিকের লোকেরা বডিটাকে পরিষ্কার করে অটপ্সির জন্যে তৈরি হচ্ছে। দেখেই রাকেশ মহিলাকে চিনতে পারল।

ইনভেস্টিগেটিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম কী?'

'জিয়া রহমতউল্লা।'

'চেন না? এ তো বিখ্যাত মডেল অ্যামেলিয়া সিদ্দিকি।'

মনে পড়ল অমৃতা কদিন আগেই এই মহিলার খবর নিচ্ছিল। ও তাহলে ড্যুসেল্ডর্ফে বাবা-মায়ের কাছে যায়নি। ছদ্মনাম নিয়ে মাথেরানে ঘাপটি মেরেছিল। ছুটি নিয়ে কোথাও না গিয়ে, নাম ভাঁড়িয়ে মাথেরানে অজ্ঞাতবাসে! তদন্ত করতেই হবে। তার আগে অমৃতার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

হটলাইনে ওকে ধরল, 'কাল মাথেরানে অ্যামেলিয়া সিদ্দিকির মুণ্ডহীন মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ওখানে জিয়া রহমতউল্লা ছদ্মনামে লুকিয়েছিল গত তিন সপ্তাহ ধরে। অটপ্সি হলেই রিপোর্ট ফ্যাক্স করছি।'

খুনের পেছনে কী এলেনার হাত? থাকতেই পারে। ও পুলিসে এসেছিল স্রেফ নিজেকে নির্দোষ দেখাতে। ওকে গ্রেপ্তার করে খুনের চার্জ আনা দরকার। তৎক্ষণাৎ ১৫১ নং ধারায় গ্রেপ্তারির অর্ডার। সময় নষ্টের মানে হয় না।

এলেনা ভীত। টেলিভিশনে অ্যামেলিয়া সিদ্দিকির মৃত্যুর খবরটা পেয়েছে। এখন দুটো পথের মধ্যেখানে। যে কোনও সময়ে পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। ওরা দেরি করলে অ্যামেলিয়ার সঙ্গীরাও খুন করতে পারে। কোনও বড় শহরই তার জন্যে নিরাপদ নয়। একমাত্র যাওয়ার জায়গা পাঞ্চেত জোংপার কাছে। কলকাতার হয়ে বাগডগরা হয়ে মনাস্টেরির পথে।

গ্রেপ্তার করতে এসে সিবিআই দেখে ও হাওয়া। অমৃতা নিশ্চিত এলেনাই অপরাধী।

***

আচমকা ওকে দেখে পাঞ্চেত অবাক! মুখচোখ দেখেই বুঝতে পারল ঝামেলায় পড়েছে। আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলিয়ে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

'ওই খুনগুলোর জন্যে পুলিস সন্দেহ করছে।' ভীত এলেনা।

'আমি তো জানি তুমি করোনি।'

'ওরা সম্ভবত গ্রেপ্তার করতে আসছে। তাই চলে এসেছি। এখন এখানে থাকব।'

'নিশ্চয়ই। বিশ্বাস রাখো। অন্যায় কখনো সত্যকে গিলতে পারে না। সত্যের পথে থাকার জন্যে তো মূল্য দিতে হবে, উন্মোচনের জন্যে, সময়ও। পার্থিবই যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না। স্বয়ং সিদ্ধার্থকেও জ্ঞান লাভের জন্যে কষ্ট পেতে হয়েছিল। তোমার উদ্বেগকে মুছতে পারব না। সব সময় তোমার পাশেই আছি যাতে বিপদ পেরিয়ে উঠতে পারো।'

শান্ত হল এলেনা। এ নতুন উপলব্ধি। অপরাধ আর সাধুতা দুটোই আপাত ধারণা ভিত্তিক। ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী যতক্ষণ না দোষী প্রমাণিত হচ্ছে অপরাধী বলা যাবে না। ভারতীয়রা তাকে নিজেদের মতো সংশোধন করে নিয়েছে। যতক্ষণ না নিরপরাধ প্রমাণিত, ততক্ষণ অপরাধী। ১৯৪৭-য়ে স্বাধীন হলেও মানসিক স্বাধীনতা বহুদূর। এখনো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাকেই অনুসরণ। মানসিকভাবে এখনো ওদেরই গোলাম।

জাতীয় প্রতিভাকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপনিবেশের গোলামরা ওদেরই প্রশংসার কাঙাল। দুঃখের হলেও সত্যি। দেশের অধিকাংশ মানুষের মানসিকতাই ঔপনিবেশিকতার অনুসারী। এখানে গুরুত্ব পুলিতজার, বুকার

বা নোবেল পুরস্কারের। প্রধানত অ্যাংলো-স্যাক্সন অনুমোদন। মানসিকভাবে দাসত্ব থেকে বেরনোর সময়। বিশ্বের চেহারা, গতিপ্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। পূর্বপুরুষদের গড়া ভিতের ওপর স্বাধীন ভাবে গড়ার সময় এসেছে।

বিশ্বের অর্থনীতিতে ভারত শক্তিশালী হচ্ছে। এবার চাই জনমানসের বদল। পাঞ্চেত এই বদলে নিঃশব্দ অনুঘটক। মোমো আর হান কায়দায় মাছের গ্যাহো নিয়ে এল, 'নিশ্চয় খিদে পেয়েছে।'

খেতে খেতে এলেনা জিজ্ঞেস করল,'কীভাবে দেশের বাসিন্দাদের নিজের ওপর আস্থা রাখতে উজ্জীবিত করতে পারব?'

পাঞ্চেত বুঝতে পারল ওর মনের ডামাডোল। বাস্তব আর বিশ্বাসের লড়াই। বাস্তব, মানুষ যা দেখতে পায়। আর বিশ্বাস মানুষ যা অনুভব করে। বাস্তবকে গড়ে নিতে পারে। বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্তশ্চক্ষুর বিষয়।

'দোলাচলে।'

'হ্যাঁ। কোনটা ঠিক পথ?'

'ঠিক বা ভুল দুটোই তোমার ইচ্ছাধীন। ত্যাগ, শান্তি আর সমন্বয়ের মধ্যে থেকে পথ বেরিয়ে আসবে। বিশ্বের সব ধর্ম তাই বলে। বৌদ্ধধর্মে অষ্টাঙ্গিক মার্গে উত্তরণ মোক্ষলাভের আশায়। চিরায়ত মানবাত্মার পরিপূর্ণতাকে নানান রূপে, চেহারায় পাবে ভিন্নভিন্ন সময়ে।'

এলেনার গুলিয়ে যাচ্ছে। পাঞ্চেত ধ্যানের মধ্যে দিয়ে উচ্চতার যে স্তরে পৌঁছেছে সে এখনও পারেনি। যা ঘটে যাচ্ছে তাতে আতঙ্কিত। অ্যামেলিয়াই খুনি নিশ্চিত হলেও প্রমাণ করবে কী করে? কোনও প্রমাণ নেই। এখন আরেক মহিলা মৃত। নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার উপায়ও নেই।

চিন্তান্বিত পাঞ্চেত ঢুকলেন, 'শুনলাম দিন কয়েকের মধ্যেই গ্যাংটকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আলোচনা সভা হতে চলেছে। হিমালয় অঞ্চলে প্রবল ভূমিকম্পে সোনার বিরাট খনির উন্মোচন হয়েছে। এতে দেশের অর্থনীতির লাভ। অত ভেবো না। বাধ্যতামূলক ছুটি পেয়েছ, উপভোগ করো। এই আলোচনায় বিশ্বের কিছু রদবদল হয় কি না দেখ।'

এলেনা আর নিতে পারছিল না। দরকার শুধু শান্তিতে ঘুম।

পাঞ্চেত ভাবছিল মানবতার লাভের কথা। আত্মার শান্তি। যা পার্থিব সম্পদ বা মূর্তিপূজা থেকে মেলে না। জন্মালে মরতেই হবে। মৃত্যু শুধু বহিরঙ্গের খোলস পরিবর্তন। এই চেতনার জন্যেই এলানেকে তৈরি করেছে।

***

পুলিস যখন এলেনাকে দিল্লিতে পেল না অমৃতার কাছে পরিষ্কার ও-ই অপরাধী। রাকেশের তদন্তের রিপোর্ট কবে পাবে তার জন্যে বসে না থেকে ধরেই নিল অ্যামেলিয়াকে খুন করে এমন কোথাও লুকিয়েছে যেখান থেকে ওকে ধরা কঠিন। লাজবন্তীকে সব জানিয়ে দেওয়াই ভালো, 'মাথেরান পুলিস অ্যামেলিয়ার মুণ্ডুকাটা দেহ পেয়েছে। জিয়া রহমাতুল্লাহ নাম নিয়ে মাথেরানে লুকিয়েছিল। সম্ভবত এলেনারই কাজ। অ্যারেস্ট করার আগেই দিল্লি থেকে হাওয়া। মোবাইলও সুইচড অফ।'

'শিওর?'

'কোনও সন্দেহ আছে? অ্যামেলিয়ার সঙ্গে একই ফ্লাইটে ও-ও তো ছিল। গুলি লাগার আগে আত্রেয়ীর পাশেও। ওরই সুযোগ বেশি মিনি-গান দিয়ে গুলি করার। তোমার কাছেই শোনা দ্বৈপায়নের সঙ্গেও হোটেলে দেখা করেছিল। নিশ্চয়ই পরে অন্য হোটেলে গিয়ে গুলি করে মেরেছে। আমার কাছে এসেছিল খুনের তদন্তের কথা বলতে। বোধহয় নিজেকে নির্দোষ দেখাতে। অ্যামেলিয়ার মৃত্যু, ওর হাওয়া হওয়া থেকেই পরিষ্কার ও-ই অপরাধী। কীভাবে ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে লিখে পাঠাচ্ছি।'

লাজবন্তী চুপ। শুনছে। এখনও নিঃসন্দেহ নয় এলেনাই খুনি। মোটিভটা ধোঁয়াশা। বরং আত্রেয়ীর সঙ্গে হান্স গ্রুবারের যোগাযোগটা আরও ভালো করে খতিয়ে দেখা দরকার। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট বলছে দুটো খুনই সুইশ

মিনি-গান দিয়ে, নিশ্চয়ই লাইসেন্স আছে। মেয়েটার বিদেশি যোগসূত্র বার করতে না পারলে বিদেশি বন্দুকের উৎসও জানা যাবে না।

মাথেরান ও দ্বৈপায়নের ক্ষেত্রে, দু জায়গাই জিয়া নামটা ব্যবহার করেছে। উদ্দেশ্য না থাকলে দ্বৈপায়নের (ওরফে দীপাঞ্জন) সঙ্গে খামোকা সেক্সের কথা বলতে যাবে কেন? ছুটি কাটাতে গেছিল মাথেরানে। যেতেই পারে। ভুয়ো পরিচয়ে কেন? অদ্ভুত। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোকে জানাল। সম্ভবত এর পেছনে বিদেশি হুক। থাকলে র, ইন্টারপোলকে জড়ান জরুরি। তার হাত-পা বাঁধা। একা খুনের পেছনে দৌড়নো অসম্ভব।

প্রমাণ ছাড়া খুনের সঙ্গে রিয়াকে জোড়া অসম্ভব। নিশ্চিত হতে মিনতি ভট্টাচার্যকে ধরল, ‘সুবিমল ব্যানার্জিকে বলেছেন রিয়া আপনাদের স্কুলে পার্ট টাইম টিচার। আপনার সঙ্গেও ভালো যোগ ছিল। খরুচে লাইফস্টাইল। ও কী তবে বেশ্যাবৃত্তি করত?’

‘খালি সময়ে ঠিক কী করত বলা কঠিন।’ মিনতি বলল।

লাজবন্তী এবার শক্ত, ‘রিয়া যদি আপনাকে ওর সব কথা বলত, ওই উড়নচণ্ডে লাইফস্টাইলের জন্যে টাকা কোত্থেকে আসত বলেনি? সত্যিটা বলুন। না হলে, গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।’

আতঙ্কে মিনতি ভীত, ‘রিয়া ভার্জিন ছিল না। এলেনাই ওর হাই প্রোফাইল ক্লায়েন্টদের খবর সংগ্রহ করতে বলেছিল’

‘কী ভাবে খবর দিতেন?’

‘ফোনে।’

‘ওর ফোন সুইচড অফ। ও কোথায়?’

‘জানি না। অনেকদিন ফোন করেনি।’

‘ওকে চিনলেন কী করে?’

‘ওর বাবার বাড়িতে কাজ করতাম। এলেনা ইন্ট্রভার্ট। ফাঁকা সময়ে আমায় পড়িয়েছে। ওর সাহায্যেই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছি। বারাসাত কলেজে ঢুকে ওখানকার কাজ ছেড়েছি।’

লাজবন্তী নিশ্চিত মিনতি মিথ্যে বলছে না। অমৃতাই সম্ভবত ঠিক। মোটিভ যা-ই হোক, ঘটনাক্রমই বলে দিচ্ছে এলেনাই মূল সন্দেহভাজন। অমৃতাকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে দরকার প্রমাণ। সে প্রমাণ কোথায়?

***

কাগজ, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থেকে প্রমোদ যখন জানতে পারল গ্যাংটকে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনা সভা হচ্ছে ব্যাপারটা সরল মনে হল না। যদিও রাজনীতির লোক নয়, বাবার সূত্রে এতদিন যেসব দেখেছে আঁচ করল খবরটার মধ্যে অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এ ধরনের গ্লোবাল সামিট রাজধানীতে হয়। এক্ষেত্রে দিল্লির বদলে গ্যাংটক কেন? সন্দেহজনক। নিশ্চয়ই পেছনে রাজনৈতিক কোনও ধান্দা আছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সিদ্ধান্তের পেছনে কলকাঠি নাড়ে অ্যামেরিকা। নিশ্চয় প্রস্তাবটা অ্যামেরিকারই।

ভাবল এলেনাকে ফোন করবে। অমৃতার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেওয়ার পরে আর কথা হয়নি। ভেবেচিন্তে অমৃতাকেই ফোনে ধরল, ‘গ্যাংটকে রাষ্ট্রসংঘের সামিটটা নিয়ে সন্দেহ আছে।’

‘তোমার ওই মহিলা এলেনা, তো খুনি। আমাদের হিসেবে তিনটে বা চারটে খুন করেছে। এখন বেপাত্তা। সামিট নিয়ে ভাবছি না। আগে ওকে খুজে বার করতে হবে।’ তড়বড় করে বলল।

এলেনা খুনি! ওকে চেনে সেই কলেজের দিনগুলো থেকে। নিশ্চয় কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে। ধরতে পারছে না কোথায়।

এলেনা পলাতক। গ্যাংটকে সামিট। সুইজারল্যান্ডে বাবার খুন। মনে হচ্ছে বড় খেলার অংশ। এই জন্যেই কী এলেনা হঠাত উধাও? অদৃশ্য সুতোগুলোর খেই আবিষ্কার করার ক্ষমতা তার নেই। এলেনাকে ফোন করল। মোবাইল সুইচড অফ। একটা হিম স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও কারণে ও গা ঢাকা দিয়েছে। যারা টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্যে হুমকি দিচ্ছিল তারা হয়ত ওকেও ভয় দেখিয়েছে।

সে-ও যে ওর সঙ্গে সুইজারল্যান্ড গেছিল সম্ভবত জেনে গেছে। যেহেতু আত্মগোপনে, ওকে না পেয়ে এলেনা। শুধু নিজের জীবনের আশঙ্কা নয়, এখন সম্ভবত এলেনারও।

আত্মগোপন করে থাকাই ভালো। সামিটে গিয়ে কিছু করতে পারবে না। দুজনের নিরাপত্তাই এখন অনিশ্চিত। এতদিন একা একা ভিলায় বোর হয়ে গেছে। কারও সঙ্গে কথা নেই। আমোদফুর্তির উপায় নেই। প্রাণ ওষ্ঠাগত। দৌড়োদৌড়ি করতে গেলে আরও বিপদ। হয়ত সামিটটা হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ পাবে। বন্দীর মতো ঈশ্বরের দিকে তাকানো ছাড়া উপায় নেই। ঈশ্বর নিশ্চয় তাকে ত্যাগ করবে না।

বাগানের আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে সকালের কফিতে চুমুক। মোবাইলে অন লাইন নিউজ পোর্টাল ডেলিহান্টে চোখ বোলাচ্ছিল। একটা খবরে নজর পড়তেই চোখ কপালে।

***

সামিটটা ডাকা বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে বিশ্বে অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা ফেরানর। সারা পৃথিবীতে যে অস্থির অবস্থা তার মধ্যে ভারসাম্য আনাই প্রধান লক্ষ্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার বিষয়ে ঐক্যমত্যতা আনা অন্যতম। যৌথ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের উপায় বার করাও।

রানিপুলে মেফেয়ার স্পা আর ক্যাসিনো গ্যাংটক সামিটের নির্দিষ্ট স্থান। রিসর্টে বাইরের কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলির নির্বাচিত নিরাপত্তা কর্মীদের ওপরেই ভার যাবতীয় সিকিউরিটি দেখভালের। ভারতীয় স্থল ও বিমান বাহিনী স্থানীয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এলাকাটাকে ঘিরে রেখেছে। ড্রনে মনিটার করছে। ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সিকিউরিটি স্যাটেলাইটগুলো থেকেও রিসর্ট ও আশপাশের ওপর কড়া নজর।

কেবল অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর ডেলিগেট, তাদের সেক্রেটারি, সিকিউরিটি কর্মীরাই স্ক্যানড হওয়ার পর হাই সিকিউরিটি জোনে ঢুকবার অনুমতি পাচ্ছে।

এই সামিট যাদের মস্তিষ্ক প্রসূত, অক্সফোর্ডের চার প্রাক্তনীরাও ওখানে। যদিও নিজেদের দেশে কোনও সরকারি পদে নেই তবু অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে ডেলিগেট হয়ে। দুনিয়ার অর্থনৈতিক ভারসাম্যে তাদের মাথাব্যথা নেই। চায়, যেভাবেই হোক স্যাটেলাইট থেকে সোনার হদিশ জানতে। একজনও যদি থাবা বসাতে পারে বিশ্বের অর্থনীতিকে তাঁবে রাখতে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এই চারমূর্তি সহ সমস্ত সিনিয়ার অফিসিয়ালরা উঠেছে ইম্পিরিয়াল ভিলায়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সোনার অবিরাম খানাতল্লাশ চালিয়ে যাচ্ছে।

***

নিজের টিমের কাছ থেকে খবরটা পেয়ে চমকে উঠল অমৃতা। জানত ফ্রাঙ্কফুর্ট নিও-মার্ক্সিস্ট ঘরানার হান্স গ্রুবার কাজ করে ধনী জার্মান টাইকুন রেইনার স্মেলঝেসিয়ানের তত্বাবধানে।

সকালেই রাকেশের ফোন, 'অ্যামেলিয়া সিদ্দিকি সম্পর্কে আরও কিছু জানতে পেরেছি।'

'ইন্টারেস্টিং?'

'কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলতে পারব না। রেইনার স্মেলঝেসিয়ান নামে এক জার্মান ওর পরিবারে একজন।'

নামটা শুনেই সিধে হয়ে বসল, 'ওর সম্পর্কে কী জানেন?'

রাকেশ ঠান্ডা গলায় বলল, 'অ্যামেলিয়া ওর নাতনি। ওর মা যে ড্যুসেলডর্ফে অধ্যাপক, রেইনারের মেয়ে।'

অমৃতার মাথা ঘুরছে। এসিটাকে র‍্যাপিড কুলে নামিয়ে আনল। এলেনাকে খুনি প্রতিপন্ন করার উৎসাহে খবরটা ঠান্ডা জল ছিটিয়ে দিল। সুইশ মিনি গানে দুটো খুন। হয়ত রেইনারের হয়ে কাজ করছিল। ও যদি রেইনারের এজেন্ট হয়, এলেনার কথা অনুযায়ী আসল খুনি, ওকে এখানে কে কাজে লাগেছে?

'খবরটা ঠিক?' ঠিক হজম হয়নি।

‘পাক্কা’, রাকেশের স্থির গলায় জবাব।

এর মধ্যে এলেনা কোত্থেকে। প্রমোদের কাছ থেকে বুঝতে হবে। ওর মোবাইল স্যুইচড অফ। বাড়িতেও ফোন করল। তারাও জানে না। শেষবার যখন প্রমোদ ফোন করে ধমকে কথা বলার জন্যে অনুতাপ হল। ওর হয়ত কিছু বলার ছিল। মোবাইল ঘেঁটে প্রমোদের কলটা বার করল। ফোন করলে পুরনো সিম থেকেই ও করে। পরে মনে হল বৃথাই। এসব বিদেশি যোগাযোগে কোনও কাজেই লাগবে না। যদিও ওর সঙ্গে কথা বললে এলেনার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। মোটিভ থেকেই খুনগুলোর সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে। তা সে খুনি অ্যামেলিয়াই হোক বা এলেনা। মেজাজের জন্যে আপসোস হচ্ছে। প্রমোদের মোবাইল সুইচড অফে কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেঁচে আছে তো?

তাড়াহুড়োতে ডিটেল নিয়ে ঠিকমতো মাথা ঘামানো হয়নি। এমনো হতে পারে এসব খুন, মানে বিনোদ কারাত, জ্যাক হ্যামিলটনের কেস দুটোও এর সঙ্গেই জড়িত। খুনের মোটিভ স্পষ্ট নয়। এ যেন পাইলটবিহীন প্লেনে উঠে পড়া। অপরাধী খোঁজার মূল পয়েন্টটাকেই অবজ্ঞা করেছে। খুনির আগে মোটিভ এস্ট্যাবলিস করা।

লাজবন্তীকে ফোনে ধরল, ‘আইজি মুম্বই রাকেশ দেশমুখ জানাল অ্যামেলিয়া জার্মান টাইকুন রেইনার স্মেলঝেসিয়ানের নাতনি। এলেনা তাহলে কোথায় কীভাবে?’

অমৃতা যেভাবে এলেনাকে জালে জড়াতে চাইছিল লাজবন্তীরও সে নিয়ে সন্দেহ ছিল। স্কাইপ চ্যাট থেকে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি এলেনাই অপরাধী, ‘বলছিলাম না আমার সন্দেহ আছে। তুমিই নিঃসন্দেহ ছিলে। যদি সত্যিই বিদেশি যোগ থাকে, এর মূল শিকড়ে পৌঁছবার ক্ষমতা আমার নেই। মোটিভও পরিষ্কার নয়। অলরেডি এটা ইন্টেলিজেন্স বিভাগে। যা সমাধান করা যায়নি সেই রিয়া-খুনের ক্ষেত্রেও নতুন সূত্র মিলেছে। এলেনা মিনতি ভট্টাচার্য নামে এখানকার একজন স্কুল টিচারের মাধ্যমে বড়লোক ক্লায়েন্টদের খবর দিতে রিয়াকে কাজে লাগাত। দেখ ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট আর কী কী বার করতে পারে।’

দুজনেই ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টকে নিজেদের ডিটেল রিপোর্ট পাঠিয়ে কাঁধ থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টায়। পারল কি?

***

বাইরে হইচইয়ের আভাসে মার্ক ইম্পিরিয়াল ভিলার স্যুট থেকে বাইরে। মেফেয়ার স্পা রিসর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনোতে কাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের সামিট শুরু হয়েছে। সারাদিন আলোচনার পর ব্যাঙ্কোয়েটে ককটেল ডিনার। ডিনার সেরে মার্ক তার ভিলায়। নাইটড্রেস পরে বেরিয়েই শুনল ডেভিড ডাল্টন নামে কেউ মারা গেছে।

‘কী করে ঘটল?’ হেড সিকিউরিটির কাছে জানতে চাইল।

‘জানার চেষ্টা হচ্ছে। এক্সকিউজ মি স্যার...’ বলতে বলতেই উধাও। কর্তব্য আগে। ডেভিড মার্কিন সরকারের অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা। যদি এই মৃত্যুর সঠিক তদন্ত না হয়, দুনিয়ায় ভুল বার্তা যাবে।

একে-অন্যকে শুভ রাত্রি জানিয়ে ডেলিগেটরা যে যার কামরায়। দেশগুলোর সরকারি প্রতিনিধিদের সন্তুষ্ট করার জন্যে প্ল্যান ছকার সময় চাই। যৌথভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে হবে। এসব নিয়ে ব্যস্ত মার্ক বুঝতেই পারছে না কী ভাবে মৃত্যু হল। কাকে জিজ্ঞেস করলে সঠিক খবর পাবে মাথায় আসছে না। বিষাদে ভারাক্রান্ত। কতদিনের বন্ধু, সঙ্গী। বুঝতেই পারছে খুন। কেন? মোটিভটাই বা কী? বোঝা না গেলে কে খুনি আন্দাজ করা যাবে না।

মিটিঙয়ের মধ্যেখানে টুকটাক দেখা হয়েছে। ক্রেমলিনের ছকটা কার্যকরী করতে ওরা এখানে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্যদের বোঝাতে হবে কাজটা হলে লাভ সকলেরই। ডেভিড ডালটনও কাল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছিল। যেহেতু অ্যামেরিকাই মাথা, সেনেটার এডোয়ার্ডস আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগ। তার দায়িত্ব, সব দেখেশুনে ফরেন সেক্রেটারিকে ঠিকমতো পরামর্শ দিয়ে, সেই মতো কাল মিটিঙে অবস্থান নেওয়া।

ওয়েটারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মার্ক জানতে পারল মৃত্যুটা প্রথমে ওয়েটারেরই নজরে আসে। সকালে চা দিতে গিয়ে সাড়া না পেয়ে। রিসেপশনে জানায়। সেখান থেকে চার্জে থাকা ম্যানেজারকে খবর দেওয়া। ম্যানেজার আর সামিট কো-অর্ডিনেটর অনেকবার ডাকার চেষ্টা করে। যখন কিছুতেই সাড়া মিলছে না, মার্কিন সিকিউরিটিকে ডেকে ঘরে ঢুকে বাথরুমে ডেভিডের মৃতদেহ আবিষ্কার।

দু-দেশের ইন্টেলিজেন্স ফরেন্সিক মৃত্যুর কারণ খুঁজতে ব্যস্ত। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে অ্যাটল্যান্টো-অ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট ডিসলোকেশন। ওখানে আঘাত পেলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু। এছাড়া কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। তারা জানিয়েছে এটা খুন। কে করল? একমাত্র বাথরুম ছাড়া গোটা ভিলাই সিকিউরিটি ক্যামেরা দিয়ে মোড়া। সব সময় কড়া নজর। আরেকটি দল ভিডিও ফুটেজ তন্নতন্ন করে দেখেছে। ডেভিড ভিলায় ঢুকে জামা-কাপড় ওয়ারড্রোবে রেখে নাইটড্রেস নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। বদলে ফেরত আসে। বিছানায় শুয়ে মোবাইলে কথা বলে। এর মধ্যেই রুম সার্ভিসকে ডেকে নাইট ক্যাপ হিসেবে জ্যাক ড্যানিয়েল হুইস্কি চায়। দেওয়া হয়েছিল। তারপর আর ভিলায় কেউ ঢোকেনি। অ্যাটলান্টো-অ্যাক্সিয়াল ডিসলোকেশনে মৃত্যু মানে সম্ভবত কারাটে জানা কারও কাজ। ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে কেবল বেলবয়ই ভিলা ছেড়ে যাচ্ছে।

নিশ্চয়ই খুন। খুনি কে?

ভিলায় বসে একজন ব্রেকফাস্ট সারছিল। মুখে স্বল্প হাসি। টাকা ক্ষমতা যখন হাত ধরাধরি করে চলে, তখন কিছুই অসম্ভব নয়। সামান্য একটা বেলবয়কে কেনা এমন কি।

মার্কিন ফরেন সেক্রেটারি সামিটে কী বললেন না বললেন তাতে কী। যেখানে অ্যামেরিকাই বিশ্ব অর্থনীতিতে সর্বেসর্বা। আসল মাথাকেই যখন উড়িয়ে দেওয়া গেছে, চিন্তা কীসের?

ডারুইন বলেছিল প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা। কখনো কী ভেবেছিল ওর তত্ত্ব এ যুগেও ফলে যাবে?

***

মনাস্টেরির মধ্যে আটকে এলেনা চিন্তিত। পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে একলাই খতিয়ে দেখছে। সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে। কোনও ব্যাখ্যা নেই। লোকেরা না ভাবেচিন্তেই যে যার মতো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছে। তাকে অপরাধী ধরে নেওয়ার আগে অমৃতার আরও ভালোভাবে তদন্ত করা উচিৎ ছিল। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার মতোও কিছু নেই। আচমকা ডেভিড ডাল্টনের খুনে চমকে উঠল! মৃত্যুটা কি পরিবর্তনের ঘটনাক্রমে রদবদল আনতে পারবে? না পারলে ইঁদুরদৌড়ের অর্থ কী? মানুষ যদি সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে, ক্ষতি কীসে?

ক্ষমতার টানাপোড়েন ধৈর্য, অন্তরের নির্মলতাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে। সম্ভবত প্রকৃতি মাতৃকাই বিশ্বে ফের ভারসাম্য আনতে ছক সাজাচ্ছে। মানবসভ্যতার ভারসাম্য রক্ষার আগাম।

‘কে সারা সারা’ ছেলেবেলার গানটা ঘুমপাড়ানিই শুধু নয়, পথ প্রদর্শকও। যার মাধুর্য আজও অটুট। দৈবের আশীর্বাদও। এখানে থেকে গেলে, বিশ্বের ঝামেলার বাইরে অন্তরদৃষ্টিকে শানিত করতে পারবে।

দূর অরণ্যের আবছা সীমারেখার দিকে তাকিয়ে যখন ভাবনার মধ্যে ডুবে, পাঞ্চেত এসে শান্ত গলায় জানতে চাইল ‘কী ভাবছিলে?’

‘যখন ভবিষ্যৎ জানি না, অকারণে বস্তু জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কী লাভ?’

‘সবাইকে সত্যিটা বলে লাভ নেই। তুমিই পারবে শান্তির বাণী ছড়াতে। প্রত্যেক জীবনেরই প্রয়োজন আছে। তোমার জীবনেরও। যতক্ষণ না সে দায়িত্ব পালন করতে পারছ, সামাজিক দায়ভার কাঁধ থেকে নামাতে পারো কী?’

এলেনা কৌতূহলী, ‘আমার জীবনের প্রয়োজন কী?’

‘বলতে পারব না। সময় এলে জানতে পারবে। বুদ্ধদেব যখন রাজত্ব ছেড়ে সত্যের সন্ধানে বেরোলেন তখন তাঁর পাঁচ শিষ্য সহ গোটা দুনিয়া তাঁকে ত্যাগ করেছিল। একাই নিজের সত্যে পৌঁছেছিলেন। সত্য

প্রতিভাত হয় নিঃসঙ্গতার মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে নয়।'

এলেনা ধর্মের বইপত্র পড়েছে। সব ধর্মই মমতা, একাত্মতা, স্থৈর্যের কথা বললেও, মানুষ ছোটে ক্ষুদ্র লাভের দিকে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। যতক্ষণ না অন্তরে শান্তির বাণী উপলব্ধি হচ্ছে, জাগতিক সুখের মোহ ছাড়া মুস্কিল।

এলেনা ভাবছিল একটু বাইরে ঘুরে আসবে। দোকানে গিয়ে শুনল গ্যাংটকে সামিটের ওখানে হাই সিকিউরিটি জোন থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খবর নিয়ে জানল লোকটা ভারতীয়। ওকে সিকিউরিটি কাস্টডিতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

***

ডেভিড মারা যাওয়ায় মার্কের মনে হল সবথেকে কাছের মানুষটাকে হারাল। পাব্লিক প্রোটেকশন ইন্সিওরেন্স কেলেংকারির জেরে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক হাল তলানিতে। ব্রিটিশ স্টার্লিং আরও পড়ার আগে, যেভাবেই হোক অ্যামেরিকাকে বিশ্ব অর্থনীতিতে নিজের জায়গায় ফেরৎ আসতে হবে। ওর মারা যাওয়ায়, ব্রিটিশ অর্থনীতিকে তোলার আশা বিশ বাঁও জলে। ভিলায় বসে আন্দাজ করার চেষ্টা করল খুনের পেছনের মোটিভ। কারণ তো আছেই। বোঝার চেষ্টা করছে এর পেছনে কার হাত। সেই দেশই ওর মৃত্যুতে লাভবান হবে।

কারাটে চপ। তাহলে কী চীন? বিশ্ব বাজারে ওদের জাল বিছিয়েই যাচ্ছে। যেহেতু অর্থনৈতিক দাদাগিরির মই বেয়ে প্রায় চূড়ায়, অ্যামেরিকার অর্থনীতিতে কী হল না হল তাতে ওদের কিছু না আসা যাওয়ারই কথা। বিশেষ করে জাপানে সুনামির পর। তাহলে কি ভারত? সরাসরি অ্যামেরিকার সঙ্গে বোধহয় লাগবে না। আঞ্চলিক ঐক্যের জন্যেই ওদের অ্যামেরিকাকে দরকার।

রেইনার আলঘানিমকে নিয়ে ওর ভিলায় ঢুকল। সোফায় এলিয়ে বসল, 'এতদিনের বন্ধুকে হারালাম। কে করল বোঝবার চেষ্টা করছি।'

'এমন কোনও রাষ্ট্র যার স্বার্থ জড়িত।' দিশদাশা সামলে সামনেই বসে আলঘানিম।

মার্ক চুপ। ওদের মাপছে। মধ্যপ্রাচ্য এই খুনে লাভবান। ওদের প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। মার্কিন অর্থনীতি শুয়ে পড়লে বাধ্য হবে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক দাদাগিরি বন্ধ করতে। রেইনার নয় তো? নাঃ, ডেভিডের মৃত্যুতে ওর লাভ নেই। তাহলে কি আলঘানিম?

তেলের খনি বাদ দিলে, অ্যামেরিকা যদি তাদের এলাকা থেকে পাততাড়ি গোটায়, ইরাক আর আফগানিস্তানের লাভ। ইরাকের তেলের সাহায্যেই মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের অর্থনীতিকে তালুতে নিতে সক্ষম হবে। অ্যামেরিকা মধ্যপ্রাচ্য, ইরাক আর আফগানিস্তান থেকে পাততাড়ি গোটালেই যুদ্ধাস্ত্র থেকে যে পরিমাণ টাকা কোষগারে ঢোকে তার অভাবে ওদের অর্থনীতি ফের বিপদে পড়বে। আলঘানিমই যদি ডেভিডের মৃত্যুর পেছনে আসল লোক হয়, অ্যাংলো-স্যাক্সনদের দখল বজায় রাখতে এখুনি ওকে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

কাজটা কীভাবে করা যায় মার্ক তা-ই নিয়ে চিন্তায়। ডেভিডের মারা যাওয়া ওকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়েছে। চুক্তিতে ব্রিটিশ ডেলিগেটদের পরামর্শ দেওয়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছে।

ক্রেমলিনে যা কথা হয়েছিল তা থেকেই মনে হয়েছিল, যেভাবে ভাবা হচ্ছে ঠিক সেভাবে হয়ত এগোবে না। আলঘানিম তার সিওপিডির জন্যে স্পিরিভা ওষুধটা ব্যবহার করে। প্রয়োজন হলে তার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সিয়ার অজন্তেই গোপনে বিশেষ এক ওষুধ কোম্পানির সঙ্গে টিওট্রোপিয়াম ব্রোমাইডের জায়গায় সোডিয়াম সায়ানাইড দিয়ে ঠিক স্পিরিভার মতো ওষুধ বানিয়ে তৈরি। তেমন দরকার হলে, সমস্ত হাই সিকিউরিটির চোখ এড়িয়ে সেই অস্ত্র ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

মার্ক এসব কুমিরের কান্নার ধারকাছে গেল না, 'ভালো লাগছে না। একা থাকতে চাই।'

'আজ এখানেই শেষ করা যাক।'

ওরা বেরোতেই স্যুটকেস থেকে ক্যাপ্সুলগুলো বার করল। মনস্থির করতে সময় লাগেনি। এখন হাহাকার করার সময় নয়। কাজ করতে হবে। হয় এখন নয়ত কখনোই নয়।

***

মেফেয়ার স্পা রিসোর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনোর আশপাশে ঘুর ঘুর করা লোকটাকে সিকিউরিটি সেলের লোকেরা ধরে প্রশ্নে জেরবার করছিল।

'নাম?'

'পালন দারুওয়ালা।'

'এই রিসর্টে কেন?'

বছর তিরিশ বয়েস। বলল, 'ছুটিতে এসেছি। এরকম সামিট আগে কখনো দেখিনি। সেই জন্যে দেখছিলাম।'

'এই রিসর্ট এখন হাই সিকিউরিটি জোন।'

'প্রোটেকশন তো থাকবেই। ভাবিনি ঘুরে দেখলে কোনও সমস্যা হবে।'

'এধরনের সামিটে ডেলিগেটদের হাই সিকিউরিটি ভিজিলেন্সে রাখা হয়। এ চত্বরে ঘোরাফেরা নিয়ম বিরুদ্ধ।'

'এতসব জানতাম না।'

'কী কর?'

'আইআইটি মুম্বই থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। মুম্বইয়ের লোখান্ডওয়ালা কমপ্লেক্সে ইলেক্ট্রিক্যাল গুডসের ব্যবসা করি।'

'থাক?'

'ওখানেই। বেন হার অ্যাপার্টমেন্টে।'

'বিয়ে?'

'হয়নি।'

হতে পারে নিরপরাধ। প্রশ্ন করার সময়ে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েনি। ওর জবানবন্দি যাচিয়ে নিতে হবে। ইনভেস্টিগেশন অফিসার মুম্বই পুলিশের রাকেশকে ফোন করল। প্রমাণ ছাড়া ধরে রাখাও যাবে না। সিবিআই থেকে ফোন পেয়ে রাকেশ আর ওর টিম তৎক্ষণাৎ কাজে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রাকেশের ফোন। পালন সত্যিই দারুওয়ালা ইলেক্ট্রনিক্স নামে একটা দোকানের মালিক। যদিও কম্পিউটার বেচে না।

পালন আন্দাজ করেছিল খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। চুপচাপ বসে। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ঢুকল, 'দারুওয়ালা ইলেক্ট্রনিক্স তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'যেতে পার। ছুটি কাটাও। তবে সামিট শেষ হওয়ার আগে এদিকে নয়।'

পালন উঠল, 'বোকামির জন্যে লজ্জিত। এদিকে আর আসছি না।'

বেরিয়ে গ্যাংটকে শপিং করতে। যে কথাটা লুকিয়ে গেল বান্ধবী অ্যামেলিয়া খুন হওয়ার পর মুলতুবি থাকা কাজ সারতে এখানে। অ্যামেলিয়া বলেছিল ওকে বিয়ে করবে। তার অবর্তমানে তাকেই ওর অপূর্ণ ইচ্ছে পূরণ করতে হবে।

***

যদিও একা থাকতেই পছন্দ, তবু অধিকাংশ সময়ে জঙ্গলে ঘুরে, মাঝেমধ্যে কাছের গেঝিং শহরে সময় কাটিয়ে এলেনা বোর হয়ে যাচ্ছিল। দিল্লিতে থাকলে আড্ডা, ছবি আঁকা, কনসার্ট বা সিনেমায় সময়টা কোথা দিয়ে পার যেত বুঝতেই পারত না। এখানে সে সবের উপায় নেই। ভেবে আবাক লাগে এরকম একটা জায়গায় পাঞ্চেত কীভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিল। আজ বোঝে ও এমন একটা স্তরে পৌছে গেছে যেখানে

পৌঁছতে এলেনার ঢের দেরি। ওই স্তরে পৌঁছলে বস্তুগত চাহিদা গৌণ হয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মে এটাই অষ্টাঙ্গিক মার্গে উত্তরণ। ও পাঞ্চেতের থেকে বহুগুণ পেছনে। ঠিক করল মনের অস্থিরতা কাটাতে গ্যাংটক যাবে।

পাঞ্চেতকে বলল, 'গ্যাংটক থেকে একটু ঘুরে আসি।'

পাঞ্চেত ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারছিল। মেয়েটা দিল্লির জীবনে অভ্যস্ত। সেই চেনা জায়গা ছেড়ে এই পরিবেশে মানিয়ে আগের মতো হতে সময় লাগবে। ওর মাথায় হাত বোলাল, 'আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। একটু আলাদা পরিবেশে না গেলে মন কী নতুন করে ভাবতে পারে?'

এলেনা জিজ্ঞেস করল, 'একা বোর হও না?'

'সবটাই মনের ব্যাপার। ছেলেবেলা থেকে এখানেই। অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন আর অন্য কোথাও থাকতে পারব না। শান্তিটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার। যা ভালো লাগে তার মধ্যেই শান্তি খুঁজে নাও।'

সামিটের জন্যে গ্যাংটক জমজমাট। কড়া নজরদারির মধ্যে লোকজন সাবধানে চলাফেরা করছে। টিবেট রোডে সোনাম দেলেক নামে একটা মাঝারি হোটেলে উঠল। মোটামুটি প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা আছে। টেরেসে বসেই হিমালয়ান রেঞ্জের তুষারাবৃত পর্বতচূড়াগুলো দেখা যায়। চিরকালই প্রকৃতি টানে। প্রকৃতির কোলে এসে পড়লেই মনটা ছেলেবেলায় ফিরে যায়, যখন সিস্টার অ্যাগনেস মেয়েদের রুমটেক মনাস্টেরি, ছাঙ্গু লেক দেখাতে গ্যাংটকে নিয়ে আসত।

গ্যাংটক থেকে ছাঙ্গু খুব দূরে নয়। যেহেতু শহরটায় ভিড়, সামিটের জন্য বাড়তি প্রহরা, ছোটবেলার স্মৃতিতে ফেরতের মধ্যেই মুক্তি। দূরে ধ্যানমগ্ন তুষারাবৃত হিমালয়ের চূড়াগুলো কে উদাস চোখে তাকিয়ে। লেকের ধারে ব্রাহ্মী হাঁসগুলো নিশ্চিন্ত আরামে তুষারগলা জলে স্নান করছে। ঠিক যেন একটা ছবি। লেকের পাশেই একটা শিব মন্দির। যেদিকে তাকাও কেবল রডোডেনড্রন, প্রিমুলা, নীল-হলুদ পপি, আইরিস ফুলের মেলা। খোলা আকাশে পাখির ডাক। আগে একবার এখানে রেড পাণ্ডাও দেখেছিল।

পাশেই একটি সুন্দর চেহারার ছেলে বসে। তার দিকে তাকিয়ে এলেনা জিজ্ঞেস করল, 'বেড়াতে?'

'হ্যাঁ, মুম্বই থেকে। এই লেকের কথা এত শুনেছি ঠিক করে ফেললাম একবার দেখে আসতেই হবে। না দেখলে জীবন বৃথা। আপনি?'

'দিল্লি। ছেলেবেলা কেটেছে এখানে। তাই ছুটি পেয়ে ঘুরতে। এসে কত কী মনে পড়ছে।'

'দারুণ।'

'হ্যাঁ। ফালতু গ্যাংটকে পড়ে না থেকে ভাগ্যিস এলাম। প্রকৃতি আমার ভীষণ প্রিয়।'

'আমরা যারা মুম্বইতে থাকি প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে লোনাভেলা, পাওনা লেকে যাই। আমি পালন দারুওয়ালা। আপনি?'

'এলেনা চৌধুরী।'

ওদের কথার মাঝখানে, বাসের কন্ডাক্টর জানাল কাছেই ধ্বস নামায় ফিরতে দেরি হবে।

এলেনা বলল, 'যদ্দুর মনে পড়ে কাছেই অ্যালপাইন ফরেস্ট। চলুন ঘুরে আসি।'

'আমারও জঙ্গল খুব ভালো লাগে। আমাদের ওখানে জঙ্গল এত কম। চলুন।'

জঙ্গল বলতে বিস্তীর্ণ ঘাস জমির মধ্যে রডোডেন্ড্রন গাছ। দূরে আংশিক তুষারাবৃত হিমালয়ের ধ্যনমগ্ন শৃঙ্গগুলো। এখানে-ওখানে গরু চরছে।

এলেনা জানতে চাইল, 'এ সময়ে এখানে?'

'কিছুদিন আগেই আমার বান্ধবী মারা গেছে। মনে হল ভিড় থেকে দূরে, প্রকৃতির মধ্যেখানে থাকলে হয়ত শান্তি পেতে পারি।'

'সেকী! কীভাবে?'

'পুলিসের সন্দেহ খুন।'

'হা ভগবান। ভাবতেই পারছি না। নিশ্চয় খুব সুন্দরী ছিল।'

'হ্যাঁ। আমি আইআইটির ইঞ্জিনিয়ার। ছোট একটা ব্যবসা আছে। ইচ্ছে ছিল দুজনে বিয়ে করে সেটল করার। এনগেজমেন্টের কথাও হচ্ছিল।'

'নাম?'

'অ্যামেলিয়া। অ্যামেলিয়া সিদ্দিকি।'

হিমেল একটা স্রোত নেমে গেল এলেনার শিরদাঁড়া বেয়ে। ফ্লাইটের সেই সহযাত্রী! যে ওই দুজনকে মেরেছে। এই জন্যেই পুলিস তার খোঁজ পাচ্ছে না। একেই বলে সমাপতন। তার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে এ ছেলেটিকে দরকার। নিয়তিই ওদের কাছে এনে দিয়েছে।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। বাসে উঠে পালনের কাছে সব শুনল। পালন উঠেছে পালজোর স্টেডিয়ামের ঠিক ওপরে নর্কহিল হোটেলে। পাঞ্চেতের কাছ থেকে শিখেছে সবের পেছনেই কার্যকারণ আছে। এখন বুঝতে পারছে আচমকা নিয়তি কেন তাকে এত জায়গা থাকতে গ্যাংটকেই নিয়ে এল।

***

মার্ক আলঘানিমের ভিলার লাউঞ্জে বসে। পেছনে ভিডিও সারভেইলান্সের ক্যামেরা। আলঘানিমের মুখ ক্যামেরার দিকে। মার্কের বিরাট চেহারা সেন্টার টেবলের বেশির ভাগ আর আলঘানিমের অর্ধেক ঢেকে। কর্নার ল্যাম্পের স্বল্প আলোয় ঘরে জাদুপূর্ণ রহস্যময় পরিবেশ। পর্দা টানা থাকায় আরও নিবিড়। মার্ক ভাবছিল মুখে যা-ই বলুক, আলঘানিম কি ডেভিডের মৃত্যুতে আদৌ নাড়া খেয়েছে?

মিনিট পনের আগে আলঘানিম ফোনে কথা বলেছে মন্ত সে তুঙের সঙ্গে 'সামিট শেষ হলেই এখানে চলে এসো।'

'কোনও প্ল্যান মাথায় এল?'

'ওই ক্রুড অয়েল রিফাইনের প্রোপোজালটা নিয়ে আমার লোকেরা ভাবছে।'

প্রস্তাবটা হাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছিল। এবার তাহলে জায়গা মতো পড়েছে। ডেভিড নেই। এই অবস্থায় শুধু অস্ত্র ব্যবসায় অ্যামেরিকা অর্থনীতি সামাল দিতে পারবে না। সেই জায়গাটা তেল নেবে। সহযোগীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইরাকের সঙ্গে একটা টাই-আপের চেষ্টায় ব্যস্ত। ইরাক যেহেতু চীনের কাছের, একটা অদূর সম্ভাবনা ফুটে উঠছে।

'তোমরা রাজি?'

'একসঙ্গে কাজের কথা ভাবাই যায়'

মেয়ের চেয়েও বেশি উদ্দীপক। হিমালয়ের কোথায় সোনা আছে তা নিয়ে আগ্রহ তলানিতে।

'নিশ্চয়ই' ফোনটা কেটে দিল।

অ্যাংলো-স্যাক্সনদের রমরমার দিন শেষ। বিশ্ব অর্থনীতিকে অন্যভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। বিশ্বের চেহারাটাই বদলে যাচ্ছে। তবু মার্ক যখন উৎসাহিত হয়ে আসতে চাইল, এড়াতে পারেনি। যদিও কোনও উৎসাহই ছিল না। ডেভিড চলে গেছে। মার্ক ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। নতুন বন্ধু খুঁজতে হবে। এতদিনের সঙ্গী, ডাকলে তো না করা যায় না।

মার্ক বলল, 'ডেভিডের মারা যাওয়াটা এখনো ঠিক নেওয়া যাচ্ছে না। ভাবলাম তোমার সঙ্গে কথা বলে হাল্কা হই। তুমিও তো ওর ভালো বন্ধু ছিলে। মানা কঠিন।'

আলঘানিম তার দিশদাশা ঠিক করল, 'কদ্দিনের বন্ধু। অক্সফোর্ডে সবাই মিলে কত মজা করেছি। ভালো লাগল তুমি এলে। ক্রেমলিনে যে কথা হয়েছিল এখন বোধহয় কাজ করবে না।'

'কেন করবে না? আমরা তিনজন তো এখনও আছি। লোকেশনের স্যাটেলাইট ছবিটা ঘেঁটে যাচ্ছি। তোমাকেও তো ছবিটার কপি দিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, কম্পিউটারেই আছে।'

'এখনও কিন্তু আশা আছে। সংশোধিত প্ল্যানে কিছু বার করতে পারি। ড্রিঙ্ক?'

‘নিশ্চয়ই।’

ওয়েটার ককটেল সসেজ, গরম মোমোর সঙ্গে ড্রিঙ্ক দিয়ে গেল।

‘সোনা ছাড়া কোনওভাবেই অর্থনীতিকে দাঁড় করানো যাবে না। ডেভিড নেই। জানি না মার্কিনীরা কীভাবে সামাল দেবে। ও-ই ছিল ওদের একমাত্র ভরসা। একসঙ্গে থাকলে এখনও আশা আছে।’

আলঘানিম মার্কের এসব ফালতু কথায় কান দিচ্ছে না। ভালো করেই জানে পিপিপি স্ক্যামের গন্ডগোলের পর একা নিজের ক্ষমতায় মার্ক কিছু করতে পারবে না। বেজিং-এ ফ্লাইট ধরার চিন্তায়। স্পিরিভার শিশি বার করে অভ্যাস মতো টেবিলে রাখল। মার্কের বিরাট চেহারা ক্যামেরা থেকে আড়াল করেছে। গেলাসটা তুলে নিল, ‘ডেভিডই যখন নেই, এখন আর চিয়ার্স করার ইচ্ছেও নেই। বরং ওর আত্মার শান্তির প্রার্থনায়। ইনশাল্লাহ।’

‘এখান থেকে কোথায় যাবে? রেইনারের সঙ্গে কথা হয়েছে?’

‘সুযোগ হয়নি। সারা দিন সামিট, ফেরার সময় খুব ক্লান্ত ছিলাম।’ সসেজ চিবিয়ে বলল। অনেক সময় নৈঃশব্দ্য কথা বলে। আলঘানিমের স্তব্ধতাই মার্কের আন্দাজকে দৃঢ়তর করছে। ক্রেমলিনেই আঁচ করেছিল। এখন আরও স্পষ্ট। সোনার ব্যাপারে ওর কোনও আগ্রহই নেই। সোনা যে কোনও অন্য ধাতুর মতোই। পশ্চিমী দুনিয়া, বিশেষ করে অ্যামেরিকাই ডলারকে বিশ্বের বাজারে শক্তিশালী রাখতে ওটার রাশ ধরে রেখেছে। দক্ষিণ অ্যামেরিকা থেকে আসা ধাতুর ওপর ওদের পুরো নিয়ন্ত্রণ। আলঘানিমের এক্তিয়ার তেল। শক্তির উৎস। সোনা নিয়ে আগ্রহ নেই কারণ বেচার বাজারের সঙ্গে যোগ নেই। বাকিদের কথা ভেবেই অন্যদের সঙ্গে সায় দিয়েছিল।

মার্ক আলঘানিমকে মাপার জন্যে বলল, ‘রেইনারকে ডেকে নেব?’

‘অন্য আরেকদিন। এখন গুরুগম্ভীর আলোচনার মুডও নেই। বরং ডেভিডের জন্যে প্রার্থনা করা যাক। ভোলবার জন্য ড্রিঙ্ক করি।’

চুপচাপ দুজনে মদ খাচ্ছে। ডেভিডকে মারা হয়েছে শিরদাঁড়ায় কারাটে স্ট্রোকে। কে? চীন না জাপান? মোটিভ নিয়েও প্রশ্ন। যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। চীন সস্তা শ্রমে বিশ্ববাজার দখল করে। প্রতিষ্ঠিত ব্র্যান্ডগুলোকে মাল সাপ্লাই দিয়েই ওদের কামাই। তারা এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। যদি সোনার খবরটা ঠিক হয় ওদের সঙ্গে হাত মেলালেই লাভ।

‘টয়লেট থেকে আসছি।’ পাথরের মতো নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল আলঘানিম।

টয়লেটে ঢুকতেই মার্ক টেবিলের স্পিরিভা ক্যাপ্সুল যা সোডিয়াম ব্রমাইডের সঙ্গে আনা সোডিয়াম সায়নাইড এলডি৫০ দিয়ে পাল্টে দিল। হাওয়ার সংস্পর্শে এলে টক্সিক ভেপার বেরোবে। ফল নিশ্চিত মৃত্যু। ক্যামেরা যেহেতু পেছনে, ওর বিশাল চেহারা এই কম আলোয় ক্যামেরা থেকে ওষুধের পরিবর্তন আড়াল করে দিল। ধরা পড়বে না।

আলঘানিম ফেরার পর মার্ক উঠে পড়ল, ‘ঠিক। এ সময় এত গুরুগম্ভীর আলোচনা মাথায়ও ঢুকবে না। পরে এ নিয়ে একদিন বসা যাবে।’

আলঘানিম মদে চুমুক দিল, ‘সেই ভালো। পরেই কথা হবে। একা থাকাই শ্রেয়।’

‘বেশি রাত করোনা, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। ড্রিঙ্কের জন্যে ধন্যবাদ।’ মার্ক বেরিয়ে গেল।

শুভরাত্রি শুধু আজকের জন্যে নয়। বরং সারা জীবনের জন্যেই শুভ হয়ে থাক। কাল অনেক কাজ। অনেক প্রশ্ন। পরদিন সকালে কীভাবে সেসব প্রশ্নের মোকাবিলা করবে তা-ই মাথায়।

***

এলেনা ভাবছিল রুমটেক মনাস্টেরি থেকে ঘুরে আসবে। সেই কবে, যখন এখানে সেন্ট মেরিজ কনভেন্টে পড়ত, তখন গিয়েছিল। তারপর আর যাওয়া হয়নি। সময়-সুযোগ পেলে পাঞ্চেতের কাছে ঘুরে গেছে, কিন্তু রুমটেকে নয়। পালনকেও সঙ্গে নেবে। খুনের সম্বন্ধে ডিটেলসও জানা যেতে পারে।

ফোন করল, 'রুমটেক যাচ্ছি। যাবেন? ক্যাবে।'

'গেলে দারুন হয়।'

গাড়িতে এলেনা জানতে চাইল, 'নিশ্চয় অনেক দিনের ঘনিষ্ঠতা?'

'বহুকালের। অ্যামেলিয়া মিক্সড ব্লাড। বাবা ভারতীয়, মা জার্মান। দুজনেই ড্যুসেল্ডর্ফে ইন্ডোলজি পড়ায়। ওখানেই বড় হয়। পলিটিক্যাল সায়েন্সে মাস্টার্স।'

'ভারতে?'

'মডেলিং কেরিয়ারের জন্যে। এখানেই ভালোভাবে করা সম্ভব। এখানের টপ মডেল।'

'আপনার সঙ্গে আলাপ?'

'অ্যাক্সিডেন্ট। বান্দ্রা ক্রসিংয়ে আমাদের গাড়ি দুটো ক্র্যাশ করে। সেখান থেকেই আলাপ। মেন্টালি ক্লিক করে গেলাম। পরে ধীরে ধীরে ভালোবাসা।'

অ্যামেলিয়া তাহলে মিক্সড ব্লাড। তার সুইশ লিঙ্ক থাকতেই পারে, যেখান থেকে মিনি গানের সাপ্লাই পেয়েছে। কারাতের মৃত্যুর পেছনেও বিদেশি যোগ। সুইশ লিঙ্ক যে ছিল বলা না গেলেও, সুইশ-জার্মান যোগ থাকতেই পারে। মেয়েটাকে মারা হল কেন? রহস্য এখানেই। সামিটে মৃত্যুর সঙ্গেও কী কোনও যোগ আছে? থাকতেই পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ধ্বসে যাওয়া অবস্থা থেকে হিটলার জার্মানিকে ফের দাঁড় করিয়েছিলেন। তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুনিয়া তোলপাড় করে দিয়েছিল। পরাজয়ের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘ জার্মানিকে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে ফেলে দেয়। হতেই পারে তারা ফের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। নয়া জার্মান ওয়েভ হয়ত হবু সুপার পাওয়ার ভারতকে তাঁবে আনার চেষ্টা করছে। তাতে কাজে লাগানো হচ্ছে সুইশ এজেন্ট ও ভারতের সহযোগীদের।

দোলাচলে রুমটেক মনাস্টেরিতে পৌঁছল। সেখান থেকে ২ কিমি দূরে ধর্মচক্র সেন্টারেও ঘুরে এল।

'জার্মানি গেছেন?' এলেনা জিজ্ঞেস করল।

'না। বিয়ের পরে যাওয়ার কথা ছিল। অ্যামেলিয়া তাই চেয়েছিল।'

এলেনার মনে হল লোকটা এখানে কেবল বেড়াতে আসেনি। সামিট চলাকালীন অন্য কিছু কাজ সারতেই এসেছে। একেই কি পুলিস সামিটে ঘুরঘুর করতে দেখে ধরেছিল? যদি এ-ই সে হয় সন্দেহ আরও জোরদার হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। এর পেছনে লেগে থাকলে কি আসল রহস্যের কাছাকাছি পৌঁছনো যাবে?

***

ড্রিঙ্ক যখন শেষ হয়ে আসছে আলঘানিম সঙ্গিনীর অভাব অনুভব করছিল। এরকম হাই সিকিউরিটি সামিটের মধ্যে ফুর্তিরও সুযোগ নেই। মন্ত সে তুঙের ওখানে দেখা যাবে। বিলাসবহুল ডিনারের পরে মন্ত সে তুঙ আতিথিয়তার কোনও কমতি রাখে না। সিরিয়াস চিন্তা আর পোষাচ্ছে না। উঠবার আগে টেবল থেকে ইনহেলারটা নিল।

দিশদাশা খুলে কম্বলের নিচে ঢোকার পর গা গুলিয়ে উঠল। বমি পাচ্ছে। অনেক কষ্টে টয়লেটে ছুটে গিয়ে হুড়হুড় করে ভেতরের সব কিছু উগড়ে দিল। প্রবল প্রস্রাব, ডায়রিয়ার চাপ। নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ফুড পয়জনিং? মোমোগুলো হয়ত ঠিকমতো সেঁকা হয়নি। হাত–পা খিঁচিয়ে উঠল তার। আচমকা মনে হল মোটেই খাওয়ার থেকে হয়নি। কেউ সম্ভবত বিষ দিয়েছে।

কে? কেন? ডেভিডের লোক, রেইনর নাকি মার্ক? মার্কের এসব করে লাভ নেই। খুব সম্ভবত রেইনার। একটা হিম স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। পেটে প্রবল মোচড়। মেঝে রক্তবমিতে ভাসিয়ে দিল। যে ভাবেই হোক টয়লেট থেকে বেডসাইড ফোনের কাছে পৌঁছতে চাইল। তার আগেই সব অন্ধকার। অতি কষ্টে টেনে টেনে গভীর শ্বাস নিল।

নিয়তি ধীরে ধীরে তার মর্ত্যলীলায় চির অবসানের পর্দা টেনে দিল।

***

পরদিন সকালে রেইনর যখন আলঘানিমের দুঃখজনক মৃত্যুর খবরটা জানতে পারল, ততক্ষণে সবকিছু তার কাছে পরিষ্কার। নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে ভারত সরকার ততক্ষণে সামিট বন্ধ করে দিয়েছে। ডেলিগেটদের বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশ ছাড়তে। রেইনর হান্স গ্রুবেরের কাছ থেকে ফোন পেল। সাবধান করতে। ও নাকি দিল্লি পুলিসের ডাক পেয়েছে। তদন্তে নাকি তার সাহায্য জরুরি।

ভেতরে ভেতরে অ্যালার্ম বাজছিলই। আরও বেশি করে বাজতে শুরু করল।

ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ নিশ্চয়ই বার করে ফেলবে গ্রুবার ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের নিও-মার্ক্সিজম ঘরানার কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, যার মাথায় রেইনর। এরকম সময়ে যদি এয়ারপোর্ট দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, তাকেও ধরে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার সম্ভাবনা। তাই এমন কোনও দিক দিয়ে পালাতে হবে যেদিকে পাহারা নেই। এই অঞ্চল সম্পর্কে খুব জ্ঞান নেই। বেরোবার আগে আরও একটা কাজও সারতে হবে। মার্ক হেনলিকে সরানো। ও জার্মানির শত্রু এতে কোনও সন্দেহই নেই। সরানোর বীজটা আগেই পুঁতে দিয়েছে। এখন শুধু ফলের অপেক্ষা। ডেমোক্র্যাটিক দলের সঙ্গে কথা বলে একুশ শতকের সাম্যবাদের আলোয় অ্যাপ্লায়েড মার্ক্সিজমের সক্রিয় প্রয়োগ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজও শুরু করেছে।

চলে যাওয়ার আগে পালনকে কাজটা সেরে ফেলার জন্যে ডাকল।

পালন জানত কী করতে হবে। মার্কের ভিলার বাইরে একঝস্টে ছোট্ট একটা জিনিস বসিয়ে রেখে এসেছে। অধিকাংশ এয়ার-কন্ডিশন ঘর ঠান্ডা করার জন্যে আর-২২ বা ফ্রেওন গ্যাস ব্যবহার করে। লিক না হলে বদলানোর দরকার পড়ে না। মার্কের ভিলার এসির সার্ভিস ভাল্ভ বদলানোর সময়েই পালন ধরা পড়েছিল। যদিও আপাত বুঝিয়েছিল ঘুরতেই ওখানে।

আচমকা সামিট বাতিল হওয়ায় সিকিউরিটির লোকেরা ভীষণ ব্যস্ত ডেলিগেটদের ফেরার প্লেন ধরার জন্যে দিল্লিতে ফেরত পাঠাতে। হট্টগোলের মধ্যে পালন মার্কের ভিলা চত্বরে ঢুকে সার্ভিস ভাল্ভ খুলে ফ্রেওন লিক করানোর কাজে যখন ব্যস্ত, খেয়ালই করেনি কেউ তার ওপর নজর রাখছে।

ঠিক ছিল মার্ক সকালের ফ্লাইটে দিল্লি যাবে। ডেভিডকে হারিয়ে আলঘানিমকে সরিয়ে দেওয়ার পরেও সোনার ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই। ঘুমোতে যাওয়ার আগে কম্পিউটারের জিপিএস থেকে সোনাটা কোথায় বোঝার চেষ্টায়। ইন্ডো-টিবেটান-চাইনিজ এলাকার কোনও এক জায়গায় ধাতুর অবস্থিতি। মানে নিশ্চয়ই সোনা। ক্রেমলিনে ডেভিড এটাই দেখিয়েছিল। অবস্থান টের পেয়েও ওটা হাতে পাওয়ার কোনও উপায় নেই। লাগেজ গুছিয়ে এসির ঠান্ডায় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ফ্লাইট ধরার জন্যে ভোরে আর জাগল না।

এলোমেলো সামিটের ওপর ফের বড়সড় ধাক্কা। ব্রিটিশ সিকিউরিটির লোক মার্ককে নিয়ে যাওয়ার সময়ে এসে দেখল ভিলা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক চেষ্টা করেও কাজ না হওয়ায় দরজা ভাঙল। মার্ক গভীর ঘুমে। পালস নেই।

হৈ-হট্টগোলের মধ্যেও একজন নাক না গলিয়ে চুপ। ভাড়ার গাড়ির অপেক্ষায়।

***

মার্ককে সরিয়ে রেইনর ঠিক করল সাধারণ রুটে ভারত ছাড়লে ধরা পড়ার আশংকা। পালনকে নিজে চালানো ভাড়া গাড়ির বন্দোবস্ত করতে বলা। এলাকার পুরো ম্যাপটা খতিয়ে দেখে নিচ্ছে। যখন অন্যরা কীভাবে যাবে তার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত, গাড়িতে উঠে পড়ল। পালন ড্রাইভার।

‘চীন-ভারত সীমান্ত হয়ে বেরোবার পথটা ভালো করে দেখে নিয়েছ?’

‘এলাকাটা খুব ভালো চিনি না। স্থানীয় সবাই বলল ছাঙ্গু থেকে যে রাস্তাটা নাথুলা-র দিকে গেছে ওটা ধরতে।’

‘ওদিকটায় তো ভারত চীন দুদিকেরই খুব কড়া সিকিউরিটি থাকবে।’

‘আমারও তা-ই ধারণা। ওই রাস্তাটা ধরছি না।’

প্রাণের দায়ে পালাবার সময়েও চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ। একদিকে প্রাকৃতিক হ্রদ, অন্যদিকে আধা বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ। অস্ট্রেলিয়ার ইন্সব্রুকের কথা মনে পড়ে যায়। ছাঙ্গু পেরোলেই জনহীন উষর প্রান্তর। কোথাও কোথাও ট্রেকাররা হাঁটছে। গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে নাথুলা রোড ধরে ঘন্টা দেড়েক বাদে দেখল এক জায়গায় রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে।

পালন বলল, ‘ডানদিকে যেতে হবে। মেন রোড ধরলে সোজা নাথুলা পাস। নাথুলা গেটের বাঁদিকে কড়া পাহারা। যত চীনের সীমান্তের দিকে যাব প্রত্যেক ১০ কিমি অন্তর চেক পোস্ট।’

‘এই ওয়াইয়ের ডান দিকেরটা কোথায় গেছে?’ রেইনর জানতে চাইল।

‘টুকলাই হয়ে হরভজন মন্দিরের দিকে।’

ওরা ডানদিকের রাস্তা ধরল। সকালের সোনালি রোদে চারপাশ ঝকঝক করছে। কোথাও হ্রদ নেই। আধা বরফে ঢাকা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ফাঁকা রাস্তা। রেইনর বেশ বুঝতে পারছে টাকার পেছনে পাগলের মতো দৌড়ে শান্তি নেই। শান্তি শুধু প্রকৃতির মধ্যেই।

ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

নিরাপদে জার্মানি ফিরতে পারলে নিও-মার্ক্সিস্ট এবং সাম্যবাদী ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন আলোয় দেখতে চেষ্টা করবে। তার আগে তো পৌঁছতে হবে। খেয়াল করেনি আরেকটা গাড়ি কখন পেছু নিয়েছে। গাড়িটার যাত্রী ও চালকের এলাকাটা নখদর্পণে। আঁকাবাঁকা এই রাস্তায় নিরাপদ দূরত্বে নিজেদেরকে আড়াল রেখে পেছনে।

হরভজন মন্দির পেরিয়ে রেইনর জিজ্ঞেস করল, ‘এই রাস্তাটা কোথায় গেছে?’

‘ভারত-চীন সীমান্তে।’

ওরা তখন ১২,৪০০ ফিট ওপরে। চারপাশের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যে মোহিত। খেয়ালই করেনি পেছনে কেউ আসছে।

‘কদ্দুর?’

‘শেষ মিলিটারি ক্যাম্প থেকে আর ৬ কিমি দূরে।’

‘মানে আর একটা ধাপ মাত্র?’

পালন হাসছে, ‘মি. স্মেলঝেসিয়ান এটা জার্মানি নয়, ভারত। এখানে ঘুষে কাজ হয়। আপনাকে সাহায্য করছি কারণ অ্যামেলিয়াকে ভালোবাসতাম। এমনকি রিয়াকেও মেরেছি শুধুমাত্র অ্যামেলিয়ার কথায়ই। একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘ওকে মারল কে?’

‘ঠিক বলতে পারব না। আলঘানিম হতে পারে। আমার আদর্শকে মেনে নিতে পারছিল না।’

‘তাহলে আলঘানিমকে মারল কে?’

‘হতে পারে মার্ক হেনলি। সম্ভবত ডেভিড ডাল্টনের মৃত্যুর হিসেব চোকাতে। কে করেছে এখন আর কিছু আসে যায় না। অক্সফোর্ডের কজনের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে। পুরোনো দিনের গৌরবকে পুনরুদ্ধারের জন্যে যেভাবেই হোক জার্মানিতে ফেরা জরুরি।’

পালন মানতে পারল না। যদি অ্যামেলিয়া আগে বলত এর মধ্যে জড়াত না। এখন দেরি হয়ে গেছে। রেইনারকে সরিয়ে দিলে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর খপ্পরে পড়ে জেল। তার থেকে প্রশমিত থাকাই শ্রেয়।

মিলিটারি ক্যাম্পে পৌঁছল। ১৬০০০ ফিট ওপরে মন কাড়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রায়। রেইনার যখন সেই সৌন্দর্যে অভিভূত পালন গার্ডদের সঙ্গে কথা বলতে গেছে। রেইনার অপেক্ষায়।

পঞ্চাশ টাকাতেই রফা হয়ে গেল।

'হয়ে গেছে। এবার যাওয়া যাক' পালন ফিরল।

ভারত-চীন সীমান্তে পাহাড় দিয়ে ভাগ করা দুটো দেশ। একদিক ভারতের, অন্যদিক চীনের। মধ্যেখানের রাস্তাটা ওদের পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাবে। শেষ বাধাটা পেরোতে পারলেই হয়। রেইনরের কী হল তাতে আগ্রহ নেই। তার দর্শনেও নয়। কেবল টাকাটা পেলেই খুশি।

হেসেইই জিজ্ঞেস করল, 'বাধা তো পেরোলেন। এবার আমার পুরস্কার?'

'যা বলবে তা-ই।' রেইনর না ভেবেই বলল।

'সীমান্ত পেরতে পারলে আমার তো প্রয়োজন নেই। টাকাটা দিন। ক্যাশ।' পালন বলল।

'কত?'

পকেট থেকে একগাদা ডয়েশে মার্কের নোট বার করে পালনকে দিল।

'কত আছে এখানে?'

'ঠিক বলতে পারব না। কয়েক মিলিয়ন হবে। চাইলে আরও ইন্টারব্যাঙ্ক ট্রান্সফার করে দেব। টাকাটা ফ্যাক্টর না। ওপারে যাওয়াটা দরকার।'

পালন নোটগুলো পকেটে ঢোকাল। প্রাপ্তির আনন্দে মসগুল। স্টিয়ারিং হুইল সামাল দেওয়ার নজর নেই। জীবনে এত টাকা দেখেনি! 'মেরা ভারত মহান' খোদাই করা পাহাড়ের পথে রেইনার কোনমতে পৌঁছতে পারলেই কাজ খতম। তারপর সোজা মুম্বইতে। চুলোয় যাক অ্যামেলিয়া। জীবনকে উপভোগ করতে টাকা প্রয়োজন। ঠিক সেই মুহূর্তেই দুর্ঘটনা। গাড়িটা আচমকা পিছলে ডানদিকে গভীর খাদের পড়তেই মাথা ঘুরে গেল। মুহূর্তে চারপাশ পাক খেতে লাগল। অকেজো সেন্সে মাথা আর ঠিক রাখতে পারল না।

পেছনের গাড়িটা তৎক্ষণাৎ স্পটে। এলেনার দেরি হয়ে গিয়েছিল। সিকিমি ড্রাইভার খাদে নেমে তুবড়ে যাওয়া গাড়িটার কাছে। যাত্রীদের টেনে বার করার চেষ্টায়। রেইনারের ঘাড় ভেঙে গেছে। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই। কেবল পালন তখনো শ্বাস টানছে। চিৎকার করল, 'গাড়ির বুটে দড়ি আছে। একজন এখনো বেঁচে। চেষ্টা করলে বেঁচে যেতেও পারে।'

এলেনা দড়ি ঝুলিয়ে, দুজনে মিলে অতিকষ্টে জীবিতজনকে গাড়িতে তুলল। পালনের সংজ্ঞা ফেরাতে যা যা দরকার, এলেনা করে যাচ্ছে। রেইনার ক্ষমতার লোভের বলি ওখানেই মৃত পড়ে রইল।

এলেনার মনে পড়ল পাণ্ডেতের কথা, 'আমরা নিয়তির খেলার পুতুল।'

সত্যি। অজানা ঈশ্বরের সুতোর টানে নাচছি।

***

গ্যাংটক জেনারেল হাসপাতালে পালনকে সুস্থ করে এলেনা টিবেট রোডে সদর থানায় নিয়ে গেল।

প্রশ্ন করল, 'কাদের হয়ে কাজ করছ? জার্মান সরকারের?'

'যা করেছি সবই অ্যামেলিয়ার ইচ্ছে পূরণ করতে।' এলেনার রুদ্রমূর্তি দেখে পালন অবাক।

'এই জার্মান লোকটিকে গাড়িতে নিয়ে এ পথে কেন? যাকে রেইনার স্মেলঝেইসেন বলে চিহ্নিত করেছি।'

'টাকার জন্যে। অনেক টাকা দিয়েছে। নিশ্চয়ই ওগুলো পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ। শুধু এটাই একমাত্র কারণ?'

সদর থানার ওসি করমজিৎ থাপা আচমকা কথার মধ্যে বলল, 'ছাড়ুন তো। এবার আমায় কথা বলতে দিন। কে আপনি?'

এলেনা তাকে পাশের ঘরে ডাকল, 'ও ঘরে একটু আসুন।'

দুজনে ফাঁকা ঘরে। এলেনা জানতে চাইল, 'কতটা কী জানেন?'

'পার্স থেকে আইডি কার্ডটা বার করল। সঙ্গে সঙ্গে থাপা স্যালুট করল, 'স্যরি ম্যাডাম। আপনার পরিচয় জানতাম না। ঠিক আছে। যা করার করুন।'

‘ঠিক আছে। পরিচয় তো জানতেন না। নিজের কাজ করেছেন।’ এলেনা বলল।

ফিরে পালনকে নিয়ে, ‘অ্যামেলিয়া কার হয়ে কাজ করছিল?’

‘ওর দাদুর হয়ে।’

‘সে কে?’

‘রেইনর স্মেলঝেইসেন। মনে হচ্ছে মারা গেছে।’

‘স্পটেই মারা গেছে। প্রোটোকল মেনে ইন্ডিয়ান আর্মি ওর বডি জার্মানদের হাতে তুলে দেবে। অ্যামেলিয়া মরল কেন?’

‘খবরেই শুনেছি। ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করে দেওয়া।’

‘কেন খুন হয়েছে?’ পালন চুপ, ‘তিন-তিনটে খুন করেছিল। আত্রেয়ী, দ্বৈপায়ন, জেসিকাকে।’

‘জানতাম না।’

‘এখানে রেইনর স্মেলঝেইসেনকে সাহায্য করতে?’

পালন এলেনাকে দেখছে। যেমন ভেবেছিল ও তাহলে ট্যুরিস্ট নয়। অপরাধের পেছনে তাড়া করেই এখানে। সে ফাঁদেই পা দিয়েছে।

‘সত্যি কথাটা বল। চাইলে সাহায্যও করতে পারি। রিয়ার গলায় ফাঁস দিয়ে মেরেছ। হ্যাঁ কি না?’

বুঝতে পারছে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। মিথ্যা বলে পার পাবে না। জেলে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। করমজিৎ বড় বড় চোখে দেখছে। এত সব ঘটনা কিছুই জানে না। মহিলা যে সবকিছুই জানে।

পালন ঢোঁক গিলল, ‘হ্যাঁ। অ্যামেলিয়া বলেছিল, তাই।’

এলেনা করমজিতের দিকে তাকাল, ‘কথাগুলো রেকর্ড করা হয়েছে তো। নিয়ে যান একে। আর কিছু জানার নেই।’

পালনকে গ্রেফতার করা হল। এলেনা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, ‘কোথাও একটু বসা যায়? কফি পেলে ভালো হত।’

‘নিশ্চয় ম্যা’ম। আমার অফিসে আসুন।’ থাপা ওকে নিজের অফিসে নিয়ে গেল।

চুপচাপ কফি খাচ্ছে এলেনা। তার দায়িত্ব শেষ।

পাঞ্চেত সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে শিখিয়েছে। ওর অন্তর্দৃষ্টিই কথাগুলোর ভেতরে পৌঁছে দিয়েছে। ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত শক্তি যোগাচ্ছে। অসত্যকে উন্মোচন করার ক্ষমতা দিয়েছে। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে করমজিৎ বিরক্ত করল না। শুধু চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে।

এক ঘন্টা বাদে শাদা পোশাকের কয়েকজন এল। করমজিৎকে বলল, ওদের জন্য একটা ঘর ছেড়ে দিতে যাতে এলেনা ওদের সঙ্গে একলা কথা বলতে পারে।

‘কনগ্রাচুলেশন, দারুন কাজ করেছ। সরকার তোমার জন্যে গর্বিত। একটা চতুর বিদেশি পরিকল্পনার খপ্পর থেকে দেশকে বাঁচিয়েছ।’

‘আমার কর্তব্যটুকু করেছি স্যার। বাড়তি কোনও ক্রেডিট পাওয়ার মতো কিছুই নয়।’

‘আন্দাজ করলে কী করে বাইরের শক্তি জড়িয়ে?’

‘আত্রেয়ীকে খুব কাছ থেকে মারা হয়। শুধুমাত্র অ্যামেলিয়া আর আমিই ওর কাছে ছিলাম। অটপ্সি থেকে জানা যায় ওকে মারা হয়েছে সুইশ মিনি গান দিয়ে যা থাকা সম্ভব একমাত্র কোনও সুইশ কারও কাছে। দ্বৈপায়নও একই ভাবে খুন। এটাই ভাবায়। কাছে থাকা কেউই ওকে মেরেছে। ও মারা যাওয়ার পর হইচইর ফাঁকে ওর ব্যাগ থেকে পার্সটা নিয়ে নিই। পরে দেখলাম ওটা আত্রেয়ীর নয়। আইডি, ফোটো সবই অন্য। ও যখন প্লেনে ওঠে নিশ্চয়ই নিজের আইডি কাছে ছিল। প্লেনে কেউ বদলে দিয়েছে। ওই মহিলা বাদে এ কাজ কে করতে পারে?’ কফিতে চুমুক, ‘প্রমোদের সঙ্গে বিনোদ কারাটের বডি আনতে গিয়ে কনফার্মড হলাম।

পুলিস যখন অটপ্সি নিয়ে ব্যস্ত আমরা বেলবয়ের কাছ থেকে জানতে পারি বিনোদ গার্লফ্রেন্ডকে হোটেলে ছেড়ে বাইরে গেছিল। নিশ্চয় কোনও পার্সোন্যাল মিটিংয়ে। পরদিন সকালে পরিকল্পিতভাবে টিটলিস রোপওয়েতে খুন। দিল্লির পুলিস কমিশনার জানাল ওই মহিলার নাম অ্যামেলিয়া সিদ্দিকি। তার ইতিহাস খতিয়ে দেখতেই হয়। আন্দাজ করাই গেছিল বিনোদের পর ওর গার্লফ্রেন্ড জেসিকাও খুন হতে পারে। কে, জানতাম না বলে ঠেকানো যায়নি। তখন বিদেশি সূত্রগুলো খতিয়ে দেখতে ব্যস্ত।'

'রিয়াকে কেন ফাঁস দিয়ে মারা হয়?'

এলেনা হাসল, 'মেয়েটা বেশ্যা নয়। মিনতির মারফৎ আমারই সহকারী। ওর কাজ কলকাতার অভিজাত মহলের সন্দেহভাজনদের বিদেশি যোগাযোগ চিহ্নিত করা। ওদের সন্দেহজনক কাজকর্মের আপডেট দিত। জানতাম না ওকে কে খুন করেছে। এখন অবশ্য পালন স্বীকার করেছে যে ও-ই করেছে। এখন জলের মতো পরিষ্কার।'

টিমের প্রধান বলল, 'সম্প্রতি ভূমিকম্পে হিমালয় বেল্টে সোনার খনি উঠে এসেছে। খনির বেশিরভাগ অংশই ভারতে, বাকিটা চীন আর তিব্বতে। চীনের সঙ্গে পুরনো ভারত-চীন চুক্তি রদবদল করে নতুন চুক্তি করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তে দু-দেশই সোনা বিক্রি করবে।'

'গ্যাংটকে সামিটের কারণ কী এটাই?'

'ঠিক তাই। যাদের মূল আগ্রহ তারা সামিটের জন্যে আসেনি। এসেছিল সোনার খোঁজ করতে। সোনা পাওয়ার আগেই লোভে একে অন্যকে মেরে দিল।'

পাঞ্চেতের কথাগুলো মনে পড়ল, 'মানুষের লোভই তাকে নিজেকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়।'

এখানে সেটাই হয়েছে। ক্ষমতার লোভ ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ধ্বংস করার দিকে মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে।

এলানা যখন দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে তখন র-এর রিক্রুটিং টিম ওকে মনিটার করে এজেন্ট নিযুক্ত করে বিনয়ী চেহারা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যে। ভারতকে রক্ষার জন্যে শ্রমসাধ্য তালিমের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

দলের বিশেষ প্রধান বলল, 'রয়ের পক্ষ থেকে অত্যন্ত দক্ষ এজেন্ট হিসেবে তোমায় সম্মান দিতে চাই।'

এলেনা চুপ। তারপর বলল, 'আমি কোনও সম্মান আশা করি না। দয়া করে আপনাদের সংস্থা থেকে আজীবনের জন্যে ছুটির ব্যবস্থা করে দিন। আপনাদের হয়ে কাজ করার মতো আনন্দের আর কিছু নেই। এখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সবথেকে বড় পার্থিব সম্মানের আশা মন থেকে মুছে ফেলার ক্ষমতা। পার্থিব লোভের ঊর্ধ্বে সামান্য মানুষের জীবনই ভালো। এই মন্ত্রই তো ভারতের আসল সম্পদ।'

'এই মুহূর্তে এর জবাব দেওয়ার অধিকার আমার নেই। তবে তোমার চাওয়াকে শ্রদ্ধা করি। দিল্লি হেড কোয়ার্টারে এ নিয়ে কথা বলব। এখন কী করবে? দিল্লি ফিরবে?'

'না, গেজিং মনাস্টেরিতে আমার শিক্ষক পাঞ্চেত জোংপার কাছে ফেরৎ যাব। দয়া করে আপনাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন। নিজের জন্যে একটু সময় চাই। অমৃতাকে বলবেন আমার ওপর থেকে চার্জ যাতে তুলে নেয়। বাকিটা নিয়ে বোর্ড চিন্তা-ভাবনা করুক।'

ওদের সঙ্গে হাত মেলানোর পর এলেনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দলের প্রধান বুঝতে পারছিল ও মোটেই এই কেস থেকে গুটিয়ে নিতে চায় না। বরং তথাকথিত সভ্য জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেরত যেতে চায় নিজের জগতে। চোখ থেকে আনন্দাশ্রু রুমালে মুছল। এলেনা চৌধুরী আজ মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত আসল সত্যিটাকে বুঝতে পেরেছে। তার শিক্ষক এই মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে সক্ষম।

ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। মানুষকে সেই সারসত্যের শিক্ষা নিতেই হয়। যুগ যুগ ধরে আক্রমণের পরেও ভারত এখনো তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে পেরেছে। এটাই ভারতবর্ষ।

***

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। জঙ্গলের ওপর অন্ধকারের আস্তরণ। চারদিকের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঝিল্লির নিরবচ্ছিন্ন কলরব। মনাস্টেরির নিচে দাঁড়িয়ে এলেনা এই নৈঃশব্দে মনের অনুরণন শুনতে আগ্রহী। দূরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। এই জায়গাটাকে নিবিড় করে চেনা।

এই ব্যাপ্ত নৈঃশব্দে নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। চারিদিকের তানহার ওপরে। প্রকৃতির কাছে ফিরে শান্ত। এটাই তার বাড়ি। পার্থিব ইঁদুর দৌড় থেকে দূরে প্রকৃতি মায়ের শান্তির কোলে।

পাঞ্চেত একটা মাটির পাত্র দিল, 'নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। মোমো খাও।'

সেঁকা মোমো খাওয়ার সময় পাঞ্চেত মাথায় হাত বোলাচ্ছে, 'ভাবছ কেন?'

'মেনে নেব, না নেব না?'

পাঞ্চেত বুঝল, 'রাজকুমার সিদ্ধার্থ যদি জ্ঞান লাভের জন্য রাজত্ব ত্যাগ করতে পারে তুমিও তানহা মানে লোভ তৃষ্ণা ত্যাগ করতে পারো। জ্ঞানের জন্য নিজের অন্তরে ডুব দাও, অনুসন্ধান করো। হয়ত অনেক জন্ম লেগে যাবে। প্রথম বাধা পেরিয়েছ। অবচেতন থেকে চেতনার আলোকে। এর পরে আরও কত বাকি। অষ্টাঙ্গিক মার্গের দৃষ্টি, প্রেম দ্বন্দ্ব, দহনের পথে। তবেই তো মুক্তি নির্বাণের পূর্ণতায়।' নিজেকে বোঝার জন্যে একা রেখে ভেতরে গেল।

একা মোমো খাচ্ছে। একটা খোলা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে। ভেতরের তীব্র আকঙ্খাকে শান্তির পথে এগোতে।

গত কয়েক বছর র-এজেন্ট হিসেবে বেশ কয়েকটা মিশন সম্পূর্ণ করেছে। কাজের চাপে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময়ই পায়নি। মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান লোকের হাতে কীভাবে বিশ্বের মানচিত্রটা বদলে যাচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করেছে। তাদের ভাবনা-চিন্তা, মানসিকতা, সম্ভাব্য কাজকর্মের ধাঁচধরণ আন্দাজ করতে হয়েছে। সত্যকে উদ্ধার করার জন্যে অনেক খাটতেও। এই পরিশ্রমে ক্লান্ত।

এখন সব কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে আগামী পথ খুঁজে নিতে চায়। পার্থিব টানাপোড়েন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক মনে পড়ে গেলঃ

'ঈশা বাস্যমিদম সর্বম যৎ কিঞ্চ যৎ জগতম জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিতা মা গৃ্ধ কস্য সিদ্ধানাম'।

অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সত্য। কেন যে মানুষ রাজনৈতিক-আর্থিক শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে দৌড়োয়? চিরায়ত সত্যকে উপেক্ষা করে সাক্ষর রাখতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, কারিগরী শক্তির পেছনে ছোটে। এই ইঁদুর দৌড়ে নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। বিশ্বপ্রকৃতি তো শেষমেশ তাদের কাছ থেকেও সেটুকুও ছিনিয়ে নেবে, এটা বোঝে না? সোনা পাওয়াতে কোন দেশ লাভান্বিত হবে, এলেনার কিচ্ছু যায় আসে না। প্রকৃতির কোলে লালিত তার সত্ত্বা আত্মার ডাক শুনতে পাচ্ছে। ফিরতে হলে এখানেই প্রকৃতির মধ্যে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৫ : ১:১) উপনিষদ সেই মন্ত্রেই তাকে দীক্ষিত করেছেঃ

'ওং পূর্ণমাদায় পূর্ণমিদং পূ্র্ণাৎ পূর্ণমুদাচ্ছুয়াত
পূ্র্ণস্য পূর্ণমাদায় পূ্র্ণমেবাবাশিশায়াৎ
ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি।

সবকিছু ভুলে প্রকৃতির কোলই তার প্রকৃত আশ্রয়। নিজের আলোতে আলোকিত হওয়া। এই শান্তির ক্রোড় থেকে অকারণ সুশৃঙ্খল বিশৃঙ্খলায় ফিরে যাওয়ার কোনও অর্থ আছে?

পাঞ্চেত বিকালের প্রার্থনা সেরে বাইরে এল। দেখল এলেনা একইভাবে বসে। বুঝতে পারল ওর মনে প্রবল আলোড়ন। পাশে বসল, 'তোমার ভেতরের দোলাচল বুঝতে পারছি। সুখে থাকবে বুঝে এখানে তোমার বাবা দিয়ে গেছিলেন। তোমায় কেবল সেটুকু শিক্ষাই দিতে পেরেছি যেটুকু করমপা লামা শিখিয়েছিল। বুঝেছিলাম প্রথানুগ যোগ্যতা অর্জন না করলে তোমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ। আজ বুঝি সিদ্ধান্তটা ভুল

ছিল না। পরীক্ষায় বুদ্ধির প্রমাণ রেখেছ। মনে হয়েছিল র-য়ে গেলে তুমি মানবতার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে। আজ তোমার ডিরেক্টর ফোন করেছিলেন। তোমার শেষ মিশনেও তুমি যথেষ্টই সফল।'

'দেশের কাজ করার জন্যে প্রচণ্ড পরিশ্রমে তালিম নিতে ত্রুটি করনি। আমার লক্ষ্যই চলার পথের ধ্রুবতারা। মিশনে গিয়ে বন্ধুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রক্তপাত, হিংসা, ঘৃণার উদ্গার দেখেছি। এই যদি দুনিয়ার বাস্তবতার আসল চেহারা, এর মধ্যে আর জড়াতে চাই না।' এলেনা কেঁদে ফেলল।

পাঞ্চেত ওকে কাঁদতে দিল। যতক্ষণ না ওর আত্মা অশ্রুকে শুষে নেবে, ততক্ষণ কোনও কথাতেই শান্তি পাবে না। অন্ধকারে এলেনা আকাশের দিকে তাকিয়ে। ওর আত্মা প্রকৃতির মধ্যে থেকে সান্ত্বনা খুঁজছে।

নিজেকে সামলে বলল, 'মানুষ কেন শান্তিতে স্বস্তিতে থাকতে পারে না? ঋগ্বেদে তো বলেছেঃ

'সং জানীধ্বং সং পৃচ্যধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।।

সমানো মমএঃ সমিতি সামিানি সমানং ব্রতং যহ চিত্তমেষাম্।

সামানেব বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতা অভিসংবিশধ্বম্।।

সমানী ব আকুতিঃ সমানা হদয়ানি বঃ।

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

আমাদের কামনা এক হোক, হৃদয় এক হোক, মন এক হোক। এসো শান্তিতে বাস করি।'

'এই শ্লোকগুলো ভালো জানি না। আমার শিক্ষক মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে শিখিয়েছে। দুর্নীতি ভরা সমাজেও শান্তি পেতে পারো, যদি তোমার মানসিকতা এরকম হয়।'

'এই অস্থিরতায় ভরা পৃথিবী আমার নয়। চাইলেও নিজের রাস্তায় চলতে পারব না।'

'তাহলে কী চাও?'

'এখানেই থাকব। তোমার সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করার চেষ্টায়।'

পাঞ্চেত হাসল, 'তোমার বিবেককে আমি চালনা করতে পারব না। নিজের ভেতরেই শান্তি খুঁজে নিতে হয়।'

কথার মাঝে এলেনার ফোন, 'র-য়ের ডিরেক্টর বলছি। শুনলাম তুমি মনাস্টেরিতে। মিশনে সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন। বিশেষ প্রতিনিধির কাছে শুনলাম তুমি র থেকে অব্যাহতি চেয়েছ।'

'মন এখন শান্তি চায় স্যার। প্রকৃতির সান্নিধ্যে নিজের কাছে ফিরতে চাই। অন্যভাবে বাঁচা। আপনাদের সাহচর্য অনেক কিছু শিখিয়েছে। দয়া করে ভুল বুঝবেন না। একলা নিজের ভেতরে ডুবে যেতে চাই। এখানেই আশা করি কাঙ্ক্ষিত সান্ত্বনা পাব।'

'বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের মিটিং-এ এই নিয়ে কথা হয়েছে। সবাই রাজি। যা চাও সে জীবনই বেছে নিতে পারো। সুখী হও। যখনই চাইবে এখানে ফেরৎ আসার দরজা সবসময়ই খোলা।'

চোখের জল শুকিয়ে এসেছে। এলেনার মুখ উজ্জ্বল। কৃতিত্বের জন্যে নয়, ত্যাগের চেতনায়। পশ্চিম সিকিমের এই প্রায় পরিত্যক্ত মনাস্টেরির অন্ধকার আকাশের নিচে নিজেকে পুনরাবিষ্কার করতে পারবে। তার পথপ্রদর্শকের সাহায্যে। প্রথাগত শিক্ষার পথ ছেড়ে জীবনের আসল শিক্ষার পথে।

আনন্দে উৎফুল্ল ঠিক শিশুর মতো। যেমন বাহির দুনিয়া বিস্মৃত সদ্যোজাত শিশু আনন্দে আত্মহারা। সে যে এই প্রকৃতিরই সন্তান।

এবার দেখার সময়। না... না... বাইরের দুনিয়াকে নয়, নিজের অন্তরেকে, আরও নিবিড়ভাবে। অন্তরের আসল সত্ত্বার সন্ধানে। যা একান্ত তারই। অচেনা আত্মার পূর্ণতার পথে।

এই লেখার প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনাই কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোনও ব্যক্তি বা ঘটনার সঙ্গে এর কোনও চরিত্র বা ঘটনার সাদৃশ্য পেলে তা সম্পূর্ণই কাকতালীয়।
এই উপন্যাসে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ বিপজ্জনক। কেউ তা নিজের জীবনে প্রয়োগ করলে তার দায় লেখকের উপর বর্তাবে না।